দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ইজরায়েল : বাঙ্গালি হিন্দুর অতীত ও ভবিষ্যৎ পাঠ
— পৃঃ ২৬

পশ্চিমবঙ্গ নিজের মেয়েকে চেয়ে প্রত্যুত্তরে কী পেল ?
— পৃঃ ১১

৭৭ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।। ১৪ জুলাই, ২০২৫।। ২৯ আষাঢ়, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ?

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ২৯ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৪ জুলাই - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

কামদুনি থেকে কসবা তৃণমূলের কসাইখানায় আর কতদিন কোরবানি? কসাইবঙ্গ ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

রথে পথভ্রষ্ট দিদি ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন? ☐ রবি মিশ্রা ☐ ৮

পশ্চিমবঙ্গ নিজের মেয়েকে চেয়ে প্রত্যুত্তরে কী পেল ☐ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ☐ ১১

সন্ত্রাসবাদের লালন, পাকিস্তানের মতো দশা হবে কানাডারও ☐ প্রণবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ☐ ১৩

ত্রিপুরার পর পশ্চিমবঙ্গে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি শিক্ষকের কান্নায় কি ডুববে মমতার সিংহাসন? ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১৫

কসবা ল' কলেজের গণধর্ষণের ঘটনা বাঙ্গালির কলঙ্ক ☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ১৭

সাবধান! শুরু হয়েছে চিকিৎসা জিহাদ ☐ শুভায় সাও ☐ ১৯

টাকা দিয়ে মৃত্যু কেনার রাজনীতি বন্ধ হোক ☐ বিশ্বপ্রিয় দাস ☐ ২০

বালুচিস্তানের স্বাধীনতার যুদ্ধ মানবিকতার লড়াই ☐ সুজিত রায় ☐ ২৩

ইজরায়েল : বাঙ্গালি হিন্দুর অতীত ও ভবিষ্যৎ পাঠ ☐ অরিন্দম ভট্টাচার্য ☐ ২৬

আমের অমৃত কথন ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ৩১

ভুবনেশ্বরের চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির ☐ দেবাশিস চৌধুরী ☐ ৩৪

দেশের দাবি : এক দেশ, এক নির্বাচন ☐ শিশির বল ☐ ৩৬

একটা ভয়ংকর অপ্রিয় সত্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে অ-ইসলাম বনাম ইসলামের মধ্যে ☐ বরুণ মণ্ডল ☐ ৪৩

প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের প্রত্যাঘাতে অসহায় দর্শকের ভূমিকায় সব ইসলামি দেশ ☐ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ☐ ৪৫

মুরাদনগরের ঘটনায় ইউনুস সরকারের পদত্যাগ করা উচিত ☐ শিতাংশু গুহ ☐ ৪৮

আইন কি শক্তিশালী সিস্টেমের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না? ☐ বিপ্লব বিকাশ ☐ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী ☐ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ☐ খেলা : ৩৮ ☐ রঙ্গম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
২১ জুলাই
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২১ জুলাই
২০২৫

সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধেও চক্রান্ত !

হিন্দুদের বিপদে পাশে দাঁড়ানো, হিন্দুদের পক্ষে কথা বলা ভারতে একসময় অপরাধ মনে করা হতো। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এখনও হিন্দুদের পক্ষে কথা বলা বর্তমান শাসকদলের পছন্দ নয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ হিন্দুদের সুখ-দুঃখের সাথী। তোষণের রাজনীতির বিরুদ্ধে সদাসোচ্চার তিনি। তাই পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তাঁর বিরুদ্ধে শুরু করেছে এক কদর্য চক্রান্ত।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে চক্রান্তের বিষয়ে আলোচনা করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

যুদ্ধ পরিস্থিতি

সৃষ্টির আদিকাল হইতেই এই বিশ্ব চরাচরের ইতিহাসের অন্যতম অঙ্গ হইল 'যুদ্ধ'। স্মরণাতীতকালে রচিত পুরাণসমূহে দেবাসুরের সংগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবহমানকাল ধরিয়া রক্তরঞ্জিত হইয়াছে ধরিত্রী। রামায়ণ-মহাভারতে উল্লেখিত হইয়াছে রথী-মহারথীদিগের দ্বৈরথের আখ্যান। প্রবাদবাক্য হইল, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। যুদ্ধের দ্বারা কখনও ধর্মের জয় এবং অধর্মের নাশ সম্ভবপর হইলেও বিভিন্ন সময়ে ইহার বিপরীত ঘটনাও ঘটিয়াছে। শুভশক্তি ও শুভবুদ্ধির পরাজয় ঘটিলে যুগ-যুগান্তরে এক ভয়ংকর অমানিশা বিশ্বকে গ্রাস করিয়াছে। মানব সভ্যতার ললাটে ঘনাইয়া উঠিয়াছে বিপর্যয় ও সংকটের কৃষ্ণবর্ণ মেঘ। বিগত শতকে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছে মানবজাতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ে জাপানের দুইটি শহরে পরমাণুবোমা পর্যন্ত নিক্ষেপ করিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তি। ইহার অভিঘাতে স্তম্ভিত হইয়াছিল সমগ্র বিশ্ব। ইহাতে সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধোন্মাদ বিশ্বনেতাদের স্বরূপ সর্বসমক্ষে হয় সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তাহাদের বিকৃত মনোবৃত্তি, অমানবিক আচরণ এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানবসমাজের কপালে ভ্রূকুটীরেখাকে প্রকটতর করিয়া তুলিয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিশ্বশান্তি অধরাই থাকিয়া গিয়াছে। ১৯৪৫ পরবর্তী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক স্তরে নানা যুদ্ধ ও সংঘর্ষের পরিস্থিতির প্রতিনিয়ত সাক্ষী থাকিয়াছে পৃথিবী। জমি-নদী-সমুদ্র, এমনকী আকাশপথের দখলদারি হইতে শুরু করিয়া উপাসনা পদ্ধতিপ্রসূত চিন্তাধারার নির্দেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন, কৌশলগত বিষয়ে সুযোগ-সুবিধার অন্বেষণ বিভিন্ন দেশকে অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে বারংবার বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত করিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে এশিয়া মহাদেশ হইল সমস্ত প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। পশ্চিমি, ঔপনিবেশিক শক্তি এশিয়ার উপর তাহাদের কর্তৃত্ব স্থাপনে ঊনবিংশ শতক হইতেই বিশেষ তৎপর রহিয়াছে। ইহার বিপ্রতীপে কমিউনিস্ট শক্তির ক্রমাগত ইন্ধনে ১৯৭০ পরবর্তী পর্যায়ে এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাথাচাড়া দিয়াছে জেহাদি শক্তি। মজহবি নির্দেশ পালনে ভয়ংকর কট্টরপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বিভিন্ন ইসলামি দেশ এবং সেই দেশগুলির জেহাদি প্রশাসন। পরিণামে বিশ্বজুড়িয়া চলিয়াছে সন্ত্রাসের বেসাতি। বিভিন্ন দেশ হইতে বিশ্বজুড়ে রপ্তানি হইয়া চলিতেছে 'সন্ত্রাসবাদ'। উদারতান্ত্রিকতার ধুয়ো তুলিয়া সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদী দমনে নপুংসক ভূমিকা পালন করিয়াছে বিভিন্ন উন্নত দেশ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় এবং অক্ষশক্তির আত্মসমর্পণের কারণে একমেরু বিশ্বব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। কিন্তু ইহার পরবর্তীতে রাশিয়া ও চীনের দ্রুত উত্থানে একমেরু বিশ্ব ধীরে ধীরে বহুমেরুতে পরিণত হইতে থাকে। নানা বিষয়ে বৃহৎ আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের মধ্যে ক্রমাগত স্বার্থের সংঘাত বিভিন্ন দেশে জন্ম দিয়াছে সীমান্ত সমস্যা, উদ্বাস্তু সংকট এবং গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাসন ক্ষমতায় অহরহ পরিবর্তন হইয়া চলিয়াছে। পরমাণু শক্তি হস্তগত করিতে তৎপর হইয়াছে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন দেশের সরকার। আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলির পক্ষ হইতে গৃহীত নানা বৈষম্যমূলক আর্থিক নীতি পরিস্থিতিকে আরও দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। অস্ত্র ব্যবসায়ীদের লোভ-লালসা ভয়াবহ আকার ধারণ করায় বিশ্বজুড়ে পুনরায় বাজিয়া উঠিয়াছে বিশ্বযুদ্ধের দামামা। প্রথাগত যুদ্ধের বাহিরেও একাধিক ক্ষেত্রে নানাভাবে বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে আধুনিক যুদ্ধের পরিসর। সাম্প্রতিক অতীতে বিশ্ববাসী সাক্ষী থাকিয়াছে কোভিড মহামারীর। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া চলিয়াছে বিস্তীর্ণ বিশ্ব। মানুষের চিন্তা-চেতনার ধারাকে বিষাইয়া তুলিয়াছে বিমর্শগত আক্রমণ। বিভিন্ন দেশের শক্তিক্ষেত্র এবং তথ্যভাণ্ডারের (পাওয়ার-গ্রিড ও ইনফরমেশন গ্রিডের) উপর চলিতেছে সাইবার আক্রমণ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিপজ্জনক প্রয়োগ ছাড়াও হ্যাকিঙের ন্যায় ঘটনায় ঘনাইয়া উঠিতেছে বিমান দুর্ঘটনার ন্যায় নানা বিপদ। এই সবকিছুর পরিণামে সংঘটিত হইতেছে ব্যাপক লোকক্ষয় ও মুদ্রাস্ফীতি। আর্মেনিয়া বনাম আজারবাইজান, রাশিয়া বনাম ইউক্রেন, ইজরায়েল বনাম হামাস, হুথি, হেজবোল্লা ও ইরান, ভারত বনাম পাকিস্তান সংঘাত সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে বিশ্ব। ভবিষ্যতে আমেরিকা, রাশিয়া, চীন-সহ ইওরোপ ও ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ রণাঙ্গণে পরস্পরের বিরুদ্ধে লিপ্ত হইলে অচিরেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের তুঙ্গমুহূর্ত উপস্থিত হইবে। সেই মুহূর্তটি হয়তো আধুনিক সভ্যতার সমূহ বিনাশ সূচিত করিবে। এই যুদ্ধ নিরসনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতা এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানবসমাজের পক্ষ হইতে আরও সদর্থক উদ্যোগ গ্রহণ বিশেষ আবশ্যক।

সুভাষিতম্

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।। (শ্রীগীতা ৩।৪২)

স্থূল শরার হতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হতে যা অতিশয় শ্রেষ্ঠ তা হলো আত্মা।

কামদুনি থেকে কসবা তৃণমূলের কসাইখানায় আর কতদিন কোরবানি?

কসাইবঙ্গ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে রেউড়ি রাজনীতি করে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যায়। ২০১৬, ২০২১ ও ২০২৪-এর ভোটে তার বিরুদ্ধে কোনো ক্ষমতাবিরোধী তত্ত্ব (অ্যান্টি ইনকামবেনসি ফ্যাক্টর) কাজ করেনি। মমতাকে অনুসরণ করে অন্যান্য রাজ্যের রাজনৈতিক দল লাভবান হয়েছে। রেউড়ির সঙ্গে যে চুরি আর ধর্ষণও চালানো যায় সেটা তারা জানে না। খেতে দিলেই যে প্রতিবাদ করার অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না, বিদেশি বামেরা তার উলটোটা রাজ্যের মানুষকে বুঝিয়েছিল। তাই ভূমি সংস্কার করে সেই ভূমিতেই তারা লুটপাট চালাত। বিরোধিতা করলে আজকের অভয়া আর কসবা কলেজের নিরীহ ছাত্রী বা অভিজিৎ সরকারের দশা করে ছাড়ত। বিরোধীদের বাড়িতে 'লাল ঘোড়া' (আগুন) ছুটিয়ে দিত। মধ্যযুগ হলে কসবার তিনটি মাতৃগর্ভের লজ্জাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হতো। আধুনিক যুগের শাস্তি ওদের জন্য নয়। লোহা দিয়েই লোহা কাটতে হয়। কঠোরতম শাস্তির দাবি কেবল সুবিধাবাদের ভাষা। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার দু'বছর পর থেকে বিদেশি বামেদের গলায় শোনা যায়, 'এখানে থাকা যায় না।'

সারদা চিট ফান্ড কেলেঙ্কারিতে মমতার নাম জড়ায়। সারদা কর্তার চিঠিতে তা ছিল। তৃণমূল ঠিক করে চুরির পাশাপাশি তারা সমানভাবে দানখয়রাতি চালাবে। এই কায়দায় মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেবে। রেউড়ি পেয়ে মমতার বিরুদ্ধে মানুষ মুখ খুলবে না। ২০১১ সালের যে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হন, সেই নির্বাচনে বিজেপি ৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এখন তারা পায় ৪০ শতাংশ ভোট। ২০১৩-তে যারা রাজ্য ছাড়তে চাইত, সেই বামেরাই এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আঁকড়ে ধরেছে। তারাই তাকে বারবার জেতাচ্ছে। প্রতিটি নির্বাচনের আগে নিয়ম করে তারা 'নো ভোট টু বিজেপি' স্লোগান তুলে তৃণমূল-বিরোধী ভোট বিভাজনে সাহায্য করছে। এটা বামপন্থীদের স্বাভাবিক বৈপরীত্য। দশ মুখে বামেরা একশো কথা বলে। একইসঙ্গে 'হ্যাঁ' আবার 'না' বলতে পারে। দু'মুখের ফাঁক দিয়েই কংগ্রেস ৩০, বাম ৩৪। আর এখনও পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ বছর শাসন করছেন। এটা বেদনার যে পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজনীতি সচেতন রাজ্য হলেও তিন দশকের আগে এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন ঘটে না।

২০২৬-এর রাজ্য ভোট বলে দেবে এই রাজ্যের রাজনৈতিক ভাবনার কতটা পরিবর্তন হয়েছে। কিছু লোক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে গর্ব করে, আবার তাঁর পরিবার নিয়ে কেচ্ছার চলচ্চিত্র বানায়। বঙ্গের মনীষীদের কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করে। আগামী ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে, কলকাতার চায়ের দোকানের আলোচনায় সে বিপরীতমুখিতা সহজেই ধরা পড়ে। সেখানে করোনা ভাইরাস আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমান সুরে আলোচিত হয়। জর্জ অরওয়েলের 'অ্যানিমাল ফার্ম'-এ পশু আর মানুষ একে অপরকে সমান চোখে দেখত। কসবার ঘটনার পর অনেকে এই রাজ্যের নাম রেখেছেন কসাইবঙ্গ। কিছু খারাপ বোঝাতে 'কসাই' শব্দ ব্যবহার হয়। যেমন 'দস্যু' বা 'ডাকাত'। ১৯৭৭ সালে কংগ্রেস কংগ্রেসকে হারিয়েছিল। ২০১১-তে সিপিএম সিপিএমকে। বিশ্লেষকরা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সেভাবে হারানো সম্ভব। তাতে মমতাকেই মমতার শত্রু হতে হবে। পনেরো বছরে এই রাজ্যে শাসক দলের একটাই মুখ।

কংগ্রেস আর বাম জমানায় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (মানুদা) আর জ্যোতি বসুর সঙ্গে অনেক মুখ ছিল। তাই ২০০০ সালে রাজনৈতিকভাবে অপরিণত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে (৫৭) মুখ্যমন্ত্রী করা হয় আর সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়রা বাতিল হয়ে যান। জ্যোতিবাবুকে তার দল জোর করে সরিয়েছিল। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী হেরে গেলে মানুবাবুও হারিয়ে যান। মানুদা হারেন ইন্দিরার সঙ্গে, আর বুদ্ধদেব হারেন অপশাসন, জনবিরোধী নীতি এবং নিজের পার্টির বিরোধিতায়। এরা সকলেই দলের ঘরের লোক ছিলেন। দলের মধ্যে মমতার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। যদিও এ বিষয় তার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে অনেক গল্প রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেবল একটাই সমস্যা— শুভেন্দু অধিকারী। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। তৃণমূলের কুচো থেকে বুড়ো সকলের কেবল 'শুভেন্দু' নামে অ্যালার্জি। শুভেন্দুই তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল-বিরোধী বিজেপির প্রধান মুখ। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসন উলটে দিতে পারেন। একবার তাকে হারিয়ে দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে হারের পর পুরো তৃণমূল শুভেন্দু সিনড্রোমে (অসুখে) আক্রান্ত। পনেরো বছর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তনের ডাকের আড়ালে যে কসাইবঙ্গ বানানোর পরিকল্পনা ছিল তা এখন বোঝা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গকে কসাইখানা বানানোর চেষ্টা শুভেন্দুবাবু এবং তাঁর দলকেই ব্যর্থ করতে হবে। তাঁরা ব্যর্থ হলে সাধারণ মানুষকে কসাইয়ের হাতেই জবাই হতে হবে। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের জন্য হয়তো এক ভয়াবহ ভবিষ্যৎ অপেক্ষমান।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

রথে পথভ্রষ্ট দিদি

বকধার্মিকেষু দিদি,

আপনি সোজা রথে গেলেও উলটো রথে দিঘায় গেলেন না কেন? এই প্রশ্নটা আমার মনে জেগেছে। তখন মনে হলো, উলটো রথের পরের দিনই তো আবার মহরম ছিল। ওটায় গেলে তো এটাতেও যেতে হয়। তাই না গিয়ে ঠিকই করেছেন। ফি বছর কলকাতায় ইসকনের রথে আপনি যান কিন্তু এবারে ও-মুখো হননি। ঠিকই করেছেন। যেমন ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘার যাবতীয় কর্মকাণ্ড বয়কট করেছেন। জগন্নাথের যেমন মাসির বাড়ি থাকে, তেমন দিঘায় তো আপনি সরকারি খরচে প্রকাণ্ড পিসির বাড়ি বানিয়েছেন। কিন্তু সেখানে ভাইপো গেলেনই না। ঠিকই করেছেন। কারণ, ভাইপো পুরোপুরি মুসলমান ভোটেই জেতেন। ভোট পাওয়ার রেকর্ড গড়েন। শুনেছি তিনি অভিষেকের থেকে 'অভিশেখ' ডাক শুনতেও রাজি।

অনেকেরই প্রশ্ন, আপনি দীঘায় রথ করতে গেলেন কেন? এই বঙ্গে রথের ঐতিহ্য তো কম নয়! দেশের দ্বিতীয় প্রাচীন রথ রয়েছে শ্রীরামপুরের মাহেশে। ১৩৯৬ সাল থেকে শুরু হওয়া মাহেশের রথ ছাড়াও বিখ্যাত প্রায় ৩০০ বছরের গুপ্তিপাড়ার রথ। ১৭৭৬ সালে শুরু হওয়া মহিষাদলের রথ। এমন অনেক উদাহরণ।

তবে রথযাত্রার ধুমধাম কলকাতাবাসী চিনেছিল ইসকনের সৌজন্যে। প্রায় চার দশক হতে চলল, কলকাতার ইসকন রথযাত্রার বয়স। দক্ষিণ কলকাতার এলবার্ট রোড থেকে জগন্নাথ-বলরাম- সুভদ্রার বিগ্রহ বহনকারী রথ পথপরিক্রমা করে ময়দানে রাখা হয়। উলটো রথ পর্যন্ত ময়দানে থাকে সেই রথ। কলকাতার ইসকনের রথ অনেকটাই নবীন। নানা কারণে রাজনৈতিক পরিসরে ইসকনের রথযাত্রার সূচনা নিয়ে খবর হতো। ইসকনকে কোনোদিনই বামেরা ভালো চোখে দেখেনি। বাম জমানায় নদীয়ার মায়াপুরে জমি নিয়ে বিতণ্ডা হয়েছিল। সিপিএম তো মনে করত, ইসকন মার্কিনি এজেন্ট।

১৯৮৮ সালে প্রথমবার ইসকনের রথ খবরে আসে। তখন সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় মিখাইল গোরবাচবের আমল গ্লাসনস্ত- পেরস্ত্রইকা পর্ব চলছে। সেই সময়ে কলকাতায় নিযুক্ত রুশ কনসাল জেনারেলকে সস্ত্রীক ইসকনের রথযাত্রার উদ্বোধন এনে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল ইসকন। তবে দিদি, আপনি সেই সবকে অতীত করে পাঁচতলা মল পুরোটাই 'মমতা' করে ফেলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই ইসকনের রথযাত্রার দখল নিয়ে নেন। আকর্ষণ বাড়াতে নুসরত জাহানকেও নিয়ে গিয়েছেন। তাছাড়াও অন্যান্য টেলি তারকাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন।

শুধু মুসলমান ভোটে তো জেতা যায় না। দরকার হিন্দু ভোটের ভাগ। যেটা অনেকটাই সরে যাচ্ছে বলে আপনার ভয়। কিন্তু মুসলমানরাও দিঘা নিয়ে ক্ষেপে গিয়ে সব ঘেঁটে দিল। এখন রক্ষে করো জগন্নাথদেব বলা ছাড়া উপায় নেই।

সে সব ফেলে কেন দীঘার রথ? আমি জানি দিদি। 'ধাম' বানিয়ে হিন্দুদের কাছে নাম কিনতে চেয়েছেন। কিন্তু বিধি বাম। অনেক নিন্দা শুনতে হয়েছে। পুরীর শঙ্করাচার্যও এর প্রতিবাদ করেছেন। আপনার পাশে থাকা দয়িতাপতিকে নিষিদ্ধ করে দেয় পুরীর মন্দির কর্তৃপক্ষ। পুরীর রাজপরিবারের সদস্য মহারাজ গজপতি দিব্য সিংহ দেব সরাসরি মামলার হুমকি দিয়ে রেখেছেন। আপনি অবশ্য সবের জন্য কোনো কারণ ছাড়াই আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।

সে সবের পরে শুরু হলো প্রসাদের নাম, রেশন দোকান থেকে প্যাঁড়া, গজা বিলি পর্ব। কথা ছিল সরকারিভাবে তথাকথিত প্রসাদ বিলি হবে। কিন্তু দেখা গেল তৃণমূলের মেজ, সেজ নেতারা ভোটের লাগিয়া 'পোসাদ' (তৃণমূলের বানান বিধি) বিলির সেই কাজ করছেন। এ দিকে আবার অন্য শোরগোল পড়ে গেল। কীভাবে তৈরি হচ্ছে, কোথায় রাখা হচ্ছে, কেন বিলি হচ্ছে, ৪২ কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে এমন অনেক প্রশ্ন। শেষে শোনা গিয়েছে অনেক প্যাঁড়া, গজা রেশন দোকানে পচে গিয়েছে। অনেক মানুষ তো নিতেই চায়নি। খুব খারাপ এটা দিদি। আরও একটা কথা, আমাকে কেউ দিতেই আসেনি। আমি না, প্যাঁড়া, গজা খুব ভালো খাই।

আগেই ফুরফুরা শরিফের কর্তারা দিঘায় সরকারি খরচে মসজিদ বানানোর দাবি তুলে রেখেছেন। এর মধ্যে আবার মুসলমানদের বাড়িতে 'পোসাদ' পাঠানো নিয়েও ক্ষিপ্ত ফুরফুরা শরিফ।

সত্যি বলছি দিদি, আপনার মনের কথাটা আমি জানি। এই সব ধর্মটর্ম সবই আপনি ভোটের জন্য করছেন। কারণ, শুধু মুসলমান ভোটে তো জেতা যায় না। দরকার হিন্দু ভোটের ভাগ। যেটা অনেকটাই সরে যাচ্ছে বলে আপনার ভয়। কিন্তু মুসলমানরাও দিঘা নিয়ে ক্ষেপে গিয়ে সব ঘেঁটে দিল। এখন 'রক্ষে করো জগন্নাথদেব' বলা ছাড়া উপায় নেই। ■

অতিথি কলম

রবি মিশ্রা

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন?

‘ওভাল অফিসে আমি পৌঁছানোর আগেই এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আমাদের জয়লাভের পরেই রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে চলমান ভয়াবহ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে। অবশ্যই হবে যুদ্ধবিরতি। যুদ্ধরত দু'পক্ষের মীমাংসাও অবশ্যম্ভাবী। জেলেনস্কি, পুতিন— দু'জনকেই আমি চিনি। সবাই দেখবেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হবে। অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে, এইসব কথাবার্তা দম্ভের পরিচায়ক। যদিও এই যুদ্ধ খুব দ্রুত শেষ হতে চলেছে।’— ২০২৩ সালের জুলাই মাসে একটি রাজনৈতিক সমাবেশে কথাগুলি বলেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পরে ট্রাম্পের দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি কি বাস্তবায়িত হয়েছে? ক্ষমতায় আসার পর থেকে ‘শান্তিস্থাপনকারী’র ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি ট্রাম্প। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ পরিস্থিতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এই যুদ্ধ থামাতে ট্রাম্প পুরোপুরি ব্যর্থ। এছাড়াও দক্ষিণ চীন সাগরে চীনা দৌরাত্ম্য ঠেকানোর বড়োসড়ো দাবিও করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। তা সত্ত্বেও দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান চীনা আধিপত্যে রাশ টানতে ব্যর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প গৃহীত শুল্কনীতিও বেশ গোলমেলে এবং ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাজনক নয়। ট্রাম্প নেতৃত্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রান্ত শুল্ক নীতি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। আফ্রিকা জুড়ে দেখা দিচ্ছে নানা নিত্যনতুন সংঘাত। ট্রাম্পের ‘বিশ্বশান্তি স্থাপনকারী’র দাবিটি যে একটি ফাঁকা আওয়াজ তা প্রমাণ করেছে সাম্প্রতিক ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধ। যুদ্ধ থামানো এবং শান্তিপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়াস চালানোর পরিবর্তে তিনি প্রতিনিয়ত আগুনে ঘি ঢালছেন।

বাস্তব পরিস্থিতি হলো, সম্প্রতি ইজরায়েল- ইরান সংঘাত সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এই যুদ্ধের অভিঘাতে জ্বলছে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া। এতদিন লড়াইটা ছিল ইজরায়েল বনাম ইরানের প্রক্সি, অর্থাৎ হামাস, হুথি, হেজবোল্লার মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির। ইজরায়েলের সঙ্গে এই জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির লড়াইয়ের আবহে গত ২ বছর ধরেই উত্তপ্ত পশ্চিম এশিয়া। বর্তমান ইরান- ইজরায়েল সংঘাত দুই দেশের সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ইরানের বিরুদ্ধে পরমাণু বোমা তৈরির অভিযোগ করে চলেছে ইজরায়েল। ইরান পরমাণু শক্তিধর হয়ে উঠলে তা ইজরায়েলের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে বলে বহু বিশেষজ্ঞেরও ধারণা। এই আবহে গত ১২ জুন ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্র এবং সামরিক ঘাঁটিগুলি নিশানা করে আক্রমণ শুরু করে ইজরায়েল। এই সামরিক অভিযানের নাম ইজরায়েল দেয়— ‘অপারেশন রাইজিং লায়ন’। এই অভিযানে ইরানের শীর্ষস্থানীয় সেনা আধিকারিক এবং পারমাণবিক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের অনেকেই নিহত হন। বহু বছর ধরেই ইজরায়েল দাবি করে আসছে যে, গোপনে পরমাণু বোমা তৈরি করছে ইরান। এই বোমা শুধুমাত্র ইজরায়েল নয়, সমগ্র পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত প্রক্সি বা অন্যান্য জেহাদি সংগঠনগুলিকেও এই বোমা ইরান সরবরাহ করতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইজরায়েল।

ইরানকে পরমাণু শক্তিধর হয়ে ওঠা থেকে বিরত রাখতে এই পদক্ষেপ বলে জানায় ইজরায়েল। ইজরায়েলি হানার পালটা হিসেবে ইরানও প্রত্যাঘাত করতে পারে বলে মনে করছিল বিশেষজ্ঞ মহল। ইরানের পরমাণুকেন্দ্র, সামরিক বাহিনীর কার্যালয় ও ঘাঁটিগুলিতে ইজরায়েল বড়ো মাপের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পর ইরানের সেনাবাহিনী ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস্ (আইআরজিসি) তাদের পক্ষ থেকে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ঘোষণা করে। তারা এই অভিযানের নাম দেয়— ‘অপারেশন ট্রু প্রমিস-৩’। এরপর ইজরায়েলের বিভিন্ন শহর লক্ষ্য করে ধেয়ে আসতে থাকে ইরানের ছোঁড়া অসংখ্য ক্ষেপণাস্ত্র। এর আগেও ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের সাক্ষী থেকেছে বিশ্ব। আগের বারের মতো এবারও ইরানের ছোঁড়া অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রতিহত করতে এবং আকাশপথেই সেগুলিকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে ইজরায়েল। ১৪ জুন থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত ইরান-ইজরায়েল উভয় পক্ষের যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং সামরিক উত্তেজনার ইতিবৃত্ত এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত হলো।

১২-১৩ জুন : ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করার সঙ্গে ইরানের সামরিক নেতৃত্বকে নিকেশ করা ছিল ইজরায়েলের টার্গেট। সেই লক্ষ্যে এদিন অভিযান চালায় ইজরায়েলি বিমানবাহিনী। ইরানের নাতাঞ্জে অবস্থিত ‘ইউরেনিয়াম এনরিচমেন্ট ফেসিলিটি’-কে (এই গবেষণাগারে ইউরেনিয়ামকে পরমাণু বোমা তৈরির উপযুক্ত করে তোলার কাজ হয়ে থাকে) টার্গেট করে বিমান হামলা চালায় ইজরায়েল। এছাড়াও ইরানের অন্যান্য স্থান থেকে পরিচালিত পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিকেও নিশানা করে আক্রমণ চালায় ইজরায়েলি যুদ্ধবিমান। ইজরায়েলের পক্ষ থেকে হওয়া আকস্মিক এই হামলায় ইরানের শীর্ষস্থানীয় সামরিক আধিকারিকরা নিহত হন। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেন যে, ইরানের শীর্ষস্থানীয় পরমাণু বিজ্ঞানীরাও ছিলেন ইজরায়েলি হানার লক্ষ্যবস্তু। পালটা প্রত্যাঘাতে ইজরায়েলের

বিভিন্ন শহরকে লক্ষ্যবস্তু বানায় ইরান। তাদের ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রের তিনটি ঢেউ ধেয়ে যায় ইজরায়েলের দিকে। ইজরায়েলের আঘাত এবং ইরানের প্রত্যাঘাতের এই আবহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে (ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপ, অর্থাৎ টিএমটিজি-র মালিকানাধীন একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বা সামাজিক মাধ্যম হলো ট্রুথ সোশ্যাল) একটি পোস্ট করেন। এই পোস্টে তিনি লেখেন, ''একটি 'চুক্তি'তে আসার জন্য তিনি ইরানকে ৬০ দিনের আল্টিমেটাম বা চূড়ান্ত শর্ত দিয়েছিলেন। শর্ত মেনে এই সময়ের মধ্যে তাদের চুক্তিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। আজ ৬১তম দিন!''

ইজরায়েলি বিমান হানায় ইরানের ৭ জন শীর্ষস্থানীয় সামরিক অফিসার নিহত হন বলে জানা গিয়েছে। তারা হলেন— ইরানের ড্রোন প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জেনারেল গোলাম আলি রশিদ, রেভোলিউশনারি গার্ডের কমান্ডার-ইন-চিফ এবং ইরানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মেজর জেনারেল হোসেন সালামি, ইরানের প্রাক্তন সেনাপ্রধান এবং আয়াতোল্লা খামেইনির পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কমান্ডার মেজর জেনারেল মহম্মদ বাঘেরি, কমান্ডার আমির আলি হাজিজাদেহ, জেনারেল মেহদি রাব্বানি, জেনারেল গোলাম রেজা মেহরাবি এবং ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেইনির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সামরিক অফিসার আলি শামখানি। ইজরায়েলি হানায় নিহত ইরানের পরমাণু বিজ্ঞানীরা হলেন— ফেরেদুন আব্বাসি, আকবর জাদে, আহমেদ রেজা দরইয়ানি, আমির হাসান ফাখাহি, মহম্মদ মহদি, সইদ বর্জি, আলি কাতিরিমি, আব্দ আল-হামিদ।

১৪ জুন : এদিন পশ্চিম ইরানের একটি ভূগর্ভস্থ অস্ত্রাগারে হামলা চালায় ইজরায়েল। ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানায় যে, দক্ষিণ ইরানের একাধিক তৈলক্ষেত্র ও জ্বালানি মজুত কেন্দ্র লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেছে ইজরায়েল। বিশ্বের বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র হলো পারস্য উপসাগরে অবস্থিত 'দক্ষিণ পার্স'। ফজর জাম গ্যাস প্ল্যান্টের সঙ্গে দক্ষিণ পার্সেও হামলা চালায় ইজরায়েলি এয়ারফোর্স (আইএএফ)।

১৫ জুন : এদিন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে পারস্পরিক বিমান হামলা অব্যাহত থাকে। ইরানের সরকারি ভবনগুলি লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইজরায়েল। ইরানের গোয়েন্দা বিভাগ ও নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রক এবং তেহরানে অবস্থিত পররাষ্ট্র মন্ত্রক হয়ে ওঠে ইজরায়েলি টার্গেট। এর বদলা নিতে ইজরায়েলের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়তে থাকে ইরান। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ইরানের পক্ষ থেকে সংঘটিত এই ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইজরায়েলের বন্দর শহর হাইফার কাছে অবস্থিত ইজরায়েলের বৃহত্তম তৈল শোধনাগার এবং ইজরায়েলের বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্র ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স।

১৬ জুন : ইরানের জাতীয় সম্প্রচারকেন্দ্র লক্ষ্য করে এদিন হামলা চালায় ইজরায়েল। একই সঙ্গে ইরানের একটি সামরিক ইউনিটের কমান্ড সেন্টারে ইজরায়েল বোমা নিক্ষেপ করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি তেহরান বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা ইরানের এফ-১৪ যুদ্ধবিমানগুলিও ধ্বংস করে ইজরায়েল। এদিন ইজরায়েল দাবি করে যে, 'প্রিসিশন এয়ারস্ট্রাইক' বা নির্ভুল লক্ষ্যে বিমান হানার মাধ্যমে ইরানের চারজন শীর্ষ গোয়েন্দাকর্তাকে তারা হত্যা করেছে।

ইজরায়েলের সেনাবাহিনী 'দ্য ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস' বা আইডিএফ জানায় যে, ১৫ জুন রাতে একটি ভবন লক্ষ্য করে তারা হামলা চালায়। এই ভবনটিতে তখন রেভোলিউশনারি গার্ড ও কুদস্ ফোর্সের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক আধিকারিকরা একটি বৈঠক করছিলেন। পরিস্থিতি ভয়ংকর দিতে যেতে থাকায়, ১৬ জুন সকালে দক্ষিণ চীন সাগর ত্যাগ করে পশ্চিম অভিমুখে রওনা হয় মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস নিমিৎজ। ১২ জুন সংঘাত শুরুর প্রথম দিন থেকেই জানা গিয়েছিল যে ইরান-ইজরায়েলের দ্বন্দ্বের উপর কড়া নজর রাখছে আমেরিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি মন্তব্যে ইরানের রাজধানী তেহরানে লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আশঙ্কা ও আতঙ্ক। ট্রাম্প এদিন বলেন, 'ইরানের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকতে পারে না। এই কথা আমি বার বার বলেছি। এই পরিস্থিতিতে সকলের অবিলম্বে তেহরান ত্যাগ করা উচিত।' ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পরেই ইরানের রাজধানীতে ব্যাপক যানজট দেখা যায়।

১৭ জুন : ইরানের বিভিন্ন শহরে এদিন বোমা নিক্ষেপ করে ইজরায়েল। পালটা আঘাতে ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে অসংখ্য ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে ইরান। ইজরায়েলের 'আয়রন ডোম' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে সেই দেশের অনেক জায়গায় গিয়ে পড়ে কিছু ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র। ইরানের তাবরিজ ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে একাধিক ভবন, গুদামঘর, রাস্তা ও টানেল ইজরায়েলি হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাশহাদ বিমানবন্দরে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ইরানি ট্যাঙ্কার বিমানকে দেখা যায় বলে খবর। তেল আভিভ ও জেরুজালেমে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ইজরায়েলি সেনা জানায় যে, ফের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। ইজরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করে যে, এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ইরানের সেনাপ্রধান (চিফ অফ স্টাফ) এবং সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনির ঘনিষ্ঠ সহযোগী আলি শাদমানিকে রাতে চালানো এক হামলায় তারা হত্যা করেছে। ট্রুথ সোশ্যালে ইরানকে হুমকি দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে করতে থাকা একের পর এক

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

পোস্টে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। একটি পোস্টে খামেইনিকে উদ্দেশ্য করে ট্রাম্প বলেন, ''আমরা জানি তথাকথিত 'সর্বোচ্চ নেতা' ঠিক কোথায় লুকিয়ে রয়েছেন। তিনি অতি সহজ টার্গেট হলেও যেখানে লুকিয়ে রয়েছেন, সেখানে তিনি নিরাপদ। আমরা তাকে বের করে হত্যা করব না। অন্ততপক্ষে আপাতত তো নয়।'' এরপর তিনি একটি পোস্ট করেন, সেখানে তিনি লেখেন, 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ!'

১৮ জুন : ইরানের সরকারি সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ইজরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত চলা সংঘর্ষে ২২০ জনের বেশি ইরানি নিহত এবং কমপক্ষে ১২০০ জন আহত হয়েছেন। ইরানের পালটা ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় প্রায় ৩০ জন ইজরায়েলি নিহত হয়েছেন বলেও এই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেইনি তার কট্টরপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কুখ্যাত। ইরান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিশেষজ্ঞরা ভেবেছিলেন যে, ট্রাম্পের দেওয়া 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ' বার্তার প্রেক্ষিতে ইসলামপন্থী নেতা খামেইনি কোনো জবাব দেবেন। এদিন সন্ধ্যায় কোনো একটি অজ্ঞাত স্থান থেকে খামেইনির পক্ষ থেকে আসে একটি সতর্কবার্তা।

এই বার্তায় বলা হয় যে, 'ইরানের বিরুদ্ধে যেকোনো মার্কিন হামলার পরিণতি হবে গুরুতর। আক্রমণকারীকে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। ইরানের উপর এই যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়াবে ইরান। আত্মসমর্পণ করবে না ইরানি জাতি।' এই সংঘর্ষে আমেরিকা যোগ দেবে কী না— এই প্রশ্নের উত্তরে তার অবস্থান স্পষ্ট করেননি ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে এদিন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়ে ট্রাম্প বলেন, 'বড়ো সমস্যায় পড়েছে ইরান এবং তারা আলোচনায় আগ্রহী।' তিনি ফের বলেন যে, ইরানের হাতে কোনো পরিস্থিতিতেই পারমাণবিক অস্ত্র থাকতে পারে না।

১৯ জুন : সংঘর্ষের সপ্তম দিনে, ইরানের ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রগুলি মধ্য ও দক্ষিণ ইজরায়েলের বেশ কয়েকটি স্থানে মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। আবার একই সময়ে ইরানের আরাকে 'ভারী জল ব্যবহারকারী পারমাণবিক চুল্লি'তে ইজরায়েল আক্রমণ করে বলে জানা যায়। ইজরায়েলের বে-এরশেভার একটি হাসপাতালে আঘাতে হানে একটি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র। তবে ইরানি রেভোলিউশনারি গার্ড দাবি করে যে, চিকিৎসাকেন্দ্রটি নয়, হাসপাতালের কাছে অবস্থিত ইজরায়েলের সামরিক পরিকাঠামো ছিল তাদের লক্ষ্যবস্তু। সারা দিন ধরে ইজরায়েলের বিভিন্ন স্থানে ইরানের একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ার পর দিনের শেষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের বিপদ থেকে ইজরায়েল সুরক্ষিত থাকবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। ইজরায়েল দাবি করে যে, কয়েক ডজন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে ইরান। তার মধ্যে একটি ছিল নিষিদ্ধ ক্লাস্টার-বোমার ওয়ারহেড-সম্পন্ন। এই ইরানি হামলায় প্রায় ২৪০ জন আহত হয়েছে। ইজরায়েলি সেনাবাহিনী ঘোষণা করে যে, রাতভর ইরানের বিভিন্ন স্থানে বিমান হামলা চালিয়েছে তারা। ইরানে আরাকে 'ভারী জল ব্যবহারকারী পারমাণবিক চুল্লি'তেও আঘাত করা হয়েছে। নাতাঞ্জের কাছে একটি স্থানকে লক্ষ্য করে আঘাতও ছিল এই অপারেশনের অংশ। উল্লেখযোগ্য যে, ইরান-ইজরায়েলের এই সংঘাতের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল রাশিয়া। ইরানের ক্ষেত্রে সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এদিন সতর্ক করে রাশিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই সংঘাতে জড়ানোর থেকে বিরত থাকতে হবে বলে জানিয়ে রাশিয়া বলে যে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হস্তক্ষেপ করলে তা হবে একটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ। প্রকৃতপক্ষে তার পরিণতি হবে অপ্রত্যাশিত ও অত্যন্ত নেতিবাচক।

২২-২৩ জুন : গত ২২ জুন ইরানের নাতাঞ্জ, ফোরডো ও ইস্ফাহানের বেশ কয়েকটি পরমাণু কেন্দ্র ও সামরিক ঘাঁটিতে যৌথভাবে বিমান আক্রমণ চালায় আমেরিকা ও ইজরায়েল। এই অভিযানে বি-টু বোম্বার স্টেলথ্ এয়ারক্র্যাফট (অত্যাধুনিক মার্কিন বোমারু বিমান যা শত্রুর রাডারকে ফাঁকি দিতে সক্ষম) ব্যবহার করে আমেরিকা। ইরানের পারমাণবিক গবেষণা সংস্থা 'দ্য অ্যাটমিক এনার্জি অর্গানাইজেশন অফ ইরান' এই হামলার কথা স্বীকার করে জানায় যে, তাদের পরমাণু কর্মসূচি জারি থাকবে। এর প্রত্যাঘাতে গত ২৩ জুন আমেরিকার সহযোগী দেশ কাতারে অবস্থিত আল-উদেইদ বিমানঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান।

যুদ্ধের গ্রাসে বিশ্ব : এই মুহূর্তে সব চেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে কি ক্রমশ এগিয়ে চলেছে বিশ্ব? এটি একটি বড়ো সম্ভাবনা কারণ অনেক দেশই বর্তমানে বিভিন্ন ফ্রন্টে নানা লড়াইতে লিপ্ত। রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের বিরোধ যেরকম তুঙ্গে পৌঁছেছে, ঠিক একইভাবে চীনের সঙ্গে তার প্রতিবেশী দেশগুলির বিরোধ দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে। এমনকী প্রতিবেশীদের নানা হুমকি দিয়ে চলেছে চীন। সাম্প্রতিক অতীতে এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সাক্ষী থেকেছে 'রেজিম চেঞ্জ'-এর, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে সরকার ভাঙাগড়ার খেলাও রয়েছে অব্যাহত। বিভিন্ন দেশের ক্ষমতাকেন্দ্রে পরিবর্তন ঘটছে বা ঘটানো হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়া বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মতো দেশগুলিতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করেছে। পরিণামে দেশগুলিতে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায়, রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধে ইতিমধ্যেই দীর্ণ-বিদীর্ণ বিশ্বকে আগামীদিনে আরও বিভক্ত ও বিভাজিত করবে পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান সামরিক উত্তেজনা। বলা বাহুল্য যে, যেকোনো ধরনের উত্তেজনা এই অঞ্চলের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে অন্যান্য যে দেশগুলির ভালো অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো ভারত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, এই অঞ্চলটি সমগ্র বিশ্বের জ্বালানির (খনিজ তেল ও গ্যাস) অন্যতম বৃহৎ উৎস। পেট্রোলিয়ামের মূল্যবৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার পরিণামে বিভিন্ন দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। যুদ্ধ বন্ধের প্রয়াস এবং সমস্ত সমস্যার সমাধানের দ্বারা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি থেকে সমগ্র বিশ্বের পরিত্রাণ বর্তমানে সময়ের দাবি।

(লেখক ইংরেজি সাপ্তাহিক 'অর্গানাইজার' পত্রিকার সহ-সম্পাদক)

পশ্চিমবঙ্গ নিজের মেয়েকে চেয়ে প্রত্যুত্তরে কী পেল

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে অভয়ার গণধর্ষণের এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পশ্চিমবঙ্গে আবার গণধর্ষণ। ২০২৪-এ ডাক্তার, আর এবার আইনের ছাত্রী। দুটি ঘটনাই ঘটল কলেজ পরিসরে। দক্ষিণ কলকাতার কসবা ল' কলেজে ঘটল এই লজ্জাজনক ও নির্মম ঘটনা। নারকীয় অপরাধের তিন অভিযুক্ত হলো টিএমসিপির প্রাক্তন ইউনিট প্রেসিডেন্ট এবং কলেজের অস্থায়ী কর্মী ৩১ বছরের মনোজিৎ মিশ্র এবং কলেজেরই অন্য দুই ছাত্র উনিশ বছরের জাইব আহমেদ ও কুড়ি বছরের প্রমিত মুখোপাধ্যায়। নির্যাতিতা ছাত্রীটিকে মনোজিৎই নাকি কলেজের গার্লস সেক্রেটারির পদ দিয়েছিল। মেয়েটি তার অভিযোগ পত্রে লিখেছে, এই তিন ধর্ষক তার উপরে ৩-৪ ঘণ্টা ধরে অত্যাচার করেছে। সে অচৈতন্য হয়ে পড়লে তাকে ওষুধ খাইয়ে, শ্বাসকষ্ট হলে ইনহেলার দিয়ে সুস্থ করিয়ে পুনরায় তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সবশেষে হুমকি দিয়ে বলেছে একথা কাউকে বললে তার বাবাকে তারা মিথ্যা মামলায় অ্যারেস্ট করিয়ে দেবে এবং তার প্রেমিককে খুন করাবে। তারা এই ধর্ষণের ভিডিয়ো রেকর্ডিংও করেছে! ভাবা যায়, আজকের উন্নত যুগে এই অসভ্য বর্বরেরা বাস করছে? অবশ্য লোকে বলছে মনোজিৎ মিশ্রের সঙ্গে শাসকদলের সর্বোচ্চ নেতা-নেত্রীদের ওঠাবসা আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার ছবিও ঘুরছে। অর্থাৎ তারা মোটেই সামান্য নয়, বরং তারা শাসক দলের ছত্রছায়ায় লালিত পালিত।

এরাজ্যে এই ঘটনা নতুন নয়, বরং বহু দিন ধরে এই ধারার প্রতিফলন, যেখানে শাসকদলের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা রাজনৈতিক মাফিয়ারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করে, ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা হরণ করছে এবং প্রশাসন নির্লজ্জভাবে চোখ বুজে রয়েছে। ছাত্রীটি বলছে, তাকে প্রথমে টয়লেটে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে সে চিৎকার করলে তাঁকে একটি ঘরে আটকে রেখে ধর্ষণ করা হয়। কলেজ চত্বরে এমন বর্বরতা ঘটলেও কর্তৃপক্ষ নিশ্চুপ। পশ্চিমবঙ্গে এখন শিক্ষার মন্দিরগুলো রাজনৈতিক অপরাধীদের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘটনার পরে এই মনোজিৎ, জাইব ও প্রমিত কিন্তু বেশ ডাকাবুকো হয়ে উঠেছে। কীসের কারণে জানি না প্রশাসন তাদের 'এমজেপি' বলে ডাকছে। মনোজিৎ নাকি কলেজে ম্যাংগো নামে বিখ্যাত। একটা সেলিব্রেটি ভাব। তবে এই ম্যাংগো নাকি অতি বিবেকবান, নারীবাদী চরিত্র! ২০২৪-এ যখন আরজি করে অভয়া কাণ্ড হয়, সকলে নির্যাতিতার ধর্ষণ ও হত্যার বিচারের দাবিতে আন্দোলনে মুখর, তখন গত ১৬ আগস্ট এই ল্যাংড়া আম কিন্তু পিছিয়ে ছিল না। সে তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছিল এক প্রতিবাদী কবিতা— 'ধর্ষকের ফাঁসি চাই, নাটক নয় বিচার চাই, অবিলম্বে বিচার চাই, দোষীদের ফাঁসি চাই'। সবার উপরে হেডিঙে লিখেছিল 'বাংলার অগ্নিকন্যা'। তখন অবশ্য ২০২৪, আগস্ট মাস, তাই অনেকেই তার জাত চিনতে পারেনি। কারণ তখন তো আমের মরসুম শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এবার এই ধর্ষণকাণ্ড জুন মাসে, আমের ভরা মরসুম। ল্যাংড়া সুবাসে পশ্চিমবঙ্গ ম-ম করছে। স্বাদে, বর্ণে, গন্ধে একেবারে অতুলনীয়। মনোজিতের বাবা আবার বলেছেন 'ছেলের স্কুল জীবন থেকেই তৃণমূলের প্রতি ভীষণ আস্থা'। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গে কাদের দৌলতে এখন 'দুয়ারে ধর্ষক' প্রকল্প চলছে? কাদের থেকে ঘরের মেয়েদের সাবধানে রাখতে হবে?

শাসকদলের মহান নেতারা অবশ্য সংবাদমাধ্যমে যথারীতি নারী জাতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সম্মানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। একজন বলছেন, 'প্রশাসন কী করবে? বন্ধু যদি বন্ধুকে ধর্ষণ করে তবে পুলিশের কী করার আছে'? আবার অন্যজন বলছেন, 'মেয়েটির ওখানে একা যাওয়া কী দরকার ছিল? ছাত্রীটি ওখানে না গেলে এই ঘটনা ঘটতোই না। অভিযুক্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে মাত্র'। আর দলের ঘোষিত মুখপাত্র ঘোষবাবু তো স্পষ্ট করে ঘষেই দিয়েছেন। বলেছেন, 'ওই ধর্ষকদের সঙ্গে দলের কোনো সম্পর্ক নেই'। ব্যাস, ল্যাটা চুকে গেল। রুষ্ট বিরোধীদের ছোঁড়া বাউন্সার বলগুলি লাফিয়ে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুঁজে আনতে সন্ধ্যে গড়াবে। ততক্ষণে খেলা শেষ। তার মানে নেতা প্রবরেরা নিদান দিয়েই দিয়েছেন, 'নিজের কলেজে পড়তে যেতে গেলে এখন থেকে হয় ছাত্রীদের সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে যেতে হবে, নয়তো পাঁচ-সাতজন প্রাইভেট সিকিউরিটি। নইলে পার্টির ছাত্রনেতারা কখন যে হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিয়ে যাবে, তারপর

২০২১ সালে 'বাংলা নিজের মেয়েকে চেয়েছিল'। আবেগে ভেসে আমাদের ঘরের মা-বোনেরা এই দলকে জয়ী করেছিল। কিন্তু সেই মেয়ে আজ পশ্চিমবঙ্গের মা-বাবাদের কাছে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফঃ ২

চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে... বাকিটা ইতিহাস। ল' কলেজের এই কাণ্ড আমাদের সামনে একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিয়েছে যে শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকলেই মেয়েরা নিরাপদ নয়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করলেও দলের নেতাদের হাতে গণধর্ষিতা হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

যে মনোজিৎকে নিয়ে এতো আলোচনা, তার রয়েছে দু' নম্বরিতে 'ষোলোকলা' পূর্ণ করার এক অমর কীর্তি। তবে এক-এক করে খুলেই বলা যাক। ১. দীর্ঘদিন ধরে জুনিয়ার ছাত্র-ছাত্রীদের র‍্যাগিং করত সে। ২. যেকোনো জায়গায় দেখা হলে ছাত্রদের তাকে গুড মর্নিং বলে সম্বোধন করতে হতো, না করলে নাকি সরাসরি চড় জুটতো, কেউ প্রতিবাদ করলে জুটতো চরম লাঞ্ছনা। ৩. সকল ছাত্র-ছাত্রীকে টিএমসিপির মিছিলে যেতে বাধ্য করত এই মনোজিৎ। ৪. ইউনিয়ন রুমে সালিশি সভা বসিয়ে বিচার করতো সে। সেই-ই ছিল জজ-হাকিম-উকিল— সবকিছু একসঙ্গে। একেবারে সুকুমার রায়ের 'বিচার' কবিতার মতো। ৫. কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে সে মিথ্যা নারী-ঘটিত মামলায় ফাঁসিয়ে দিত। ৬. বিভিন্ন সময় ছাত্রীদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে বাধ্য করা হতো। তাদের নগ্ন ছবি মোবাইলে তুলে রাখত। পরে আবার তারা সঙ্গ দিতে অস্বীকার করলে তাদের সেই ছবি বাজারে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দিত। ৭. বিভিন্ন সময়ে ছাত্রীদের ভিডিয়ো কল করতো এবং সেই কল তাদের ধরতেই হতো। না ধরলে অন্য ট্রিটমেন্ট। ৮. মেয়েদের দেখে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতো প্রকাশ্যে, যা দেখে দলের ছেলেরা মজা নিত। কেউ প্রতিবাদ করতে পারত না। ৯. ইচ্ছামতো পরীক্ষার ফর্ম আটকে রেখে দিত। ১০. পরীক্ষার্থীদের থেকে কাটমানি নিতো। ১১. তাকে ১ লক্ষ টাকা দিলে যে কেউ ল' কলেজে ভর্তি হয়ে যেতে পারতো। ১২. সে শুধু কসবা ল' কলেজেই নয়, পার্টির প্রচ্ছন্ন মদতে অন্য কলেজে গিয়েও দাদাগিরি চালাতো। ১৩. ২০২৩ সালে সে জেলও খেটেছিল। ১৪. ক'মাস আগেও পুলিশকে মারার ঘটনায় তার নামে মামলা হয়েছিল। ১৫. কোর্সের সময়কাল পেরিয়ে যাওয়ার পরে আরও চার বছর পর কলেজে বেআইনিভাবে ভর্তি হয়েছিল সে, তবে শেষ পর্যন্ত পাশ করে বেরিয়েছিল কিনা জানা নেই। ১৬. সে এই কলেজে ক্যাজুয়াল স্টাফ হিসেবে চাকরি করেও কী করে কোর্টে প্র্যাকটিস করে? অর্থাৎ এই কলেজে তার পুরো জার্নিটাই বেআইনি দু-নম্বরি, জালি প্রহসন মাত্র। এমন গুণধর নেতাকে নিয়ে টিএমসিপি কেন গর্ব করবে না! সে তো প্রকৃতপক্ষেই সুকুমার রায়ের 'সৎ পাত্র'-এর গঙ্গারাম। তাইতো তাবড় নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে তার এত সখ্য।

এখনো রাজ্যবাসী হয়তো ভাবছে, ধর্ষণ আরজি করে হয়েছে, কসবা ল' কলেজে হয়েছে, কিন্তু আমাদের ঘরে তো হয়নি। সেজন্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। এই জানুয়ারিতে রামনগরে সাত বছরের শিশু কন্যার ধর্ষণ— অভিযুক্ত শাসক নেতা ফারুক গাজি। ফেব্রুয়ারি মাসে মুরারইতে মূক ও বধির গৃহবধূ ধর্ষণ— অভিযুক্ত শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী তাপস মণ্ডল। মার্চে মালদায় বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ— অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা অমল মণ্ডল। ওই মাসে মালদার আরেক বাড়িতে ঢুকে অন্য এক মহিলাকে ধর্ষণ— অভিযুক্ত মাসুদুর রহমান। মার্চে নারায়ণগড়ের অন্য একটি ঘটনায় পার্টি অফিসে ডেকে মহিলাকে ধর্ষণ— অভিযুক্ত পার্টির অঞ্চল সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত শীট ও শান্তি ভুঁইয়া। মে মাসে মিনাখায় বাড়ির ভেতর ঢুকে গৃহবধূকে ধর্ষণ— অভিযুক্ত নেতা বাবুসোনা মীর ও রবিউল। জুন মাসে গড়বেড়ায় নাবালিকাকে ধর্ষণ— অভিযুক্ত মুজিবুর মণ্ডল— কী মানে হচ্ছে? ধর্ষক নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছে কিনা?

এই মনোজিৎদের হাত অনেক লম্বা। শাসকদলের ওপর তলার তাবড় তাবড় নেতা-নেত্রীর সঙ্গে ওদের যোগাযোগ। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করলেও তারা যে ছাড়া পেয়ে যাবে না তার কোনো গ্যারান্টিও নেই। এই মনোজিতেরা গার্ডরুমে নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে যেভাবে ধর্ষণ করল তাতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে কলেজগুলোয় নিরাপত্তা আদৌ আছে কি? বিকেল চারটের পরে কলেজ ছুটি হয়ে যায়। তার পরে ছাত্রসংসদের ঘরে রাত্রি ১০টা/১২টা পর্যন্ত মনোজিৎরা সেখানে কী করছিল? সেই সময় কলেজে কি কোনো কর্মী বা নিরাপত্তারক্ষী উপস্থিত ছিল না? কেউ-ই কি কিছু লক্ষ্য করেনি? আর আইন কলেজের ভেতর আইনের ছাত্রীরাই যদি ধর্ষণের শিকার হয় তবে আইন কাদের বিচার করবে? মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি পরিবারের বাবা-মায়েরা কোন ভরসায় তাঁদের মেয়েদের কলেজে পড়াশোনা করতে পাঠাবেন? শাসকদলের রাক্ষসগুলোর হাত থেকে কে বাঁচাবে তাদের? তাপস পালের অতৃপ্ত আত্মা আজ আক্ষেপ করে বলছে 'আমি ঘরে ঢুকিয়ে রেপ করার কথা বলেছিলাম ঠিকই কিন্তু আমার পার্টির চেলা-চামুণ্ডারা তো আজ বাস্তবে হাসপাতালে, কলেজে ঢুকে রেপ করছে। তবে আমি একা কেন সেদিন দোষের ভাগি হয়েছিলাম?'

২০২১ সালে 'বাংলা নিজের মেয়েকে চেয়েছিল'। আবেগে ভেসে আমাদের ঘরের মা-বোনেরা এই দলকে জয়ী করেছিল। কিন্তু সেই মেয়ে আজ পশ্চিমবঙ্গের মা-বাবাদের কাছে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী নিরাপত্তা এই পশ্চিমবঙ্গে আজ নিছক ঠাট্টা। হাঁসখালি কাণ্ডে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের পর পুড়িয়ে মারা হলো, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তিলোত্তমার ধর্ষণ ও হত্যা হলো, কসবা ল' কলেজে ছাত্রী গণধর্ষিতা হলো— অভিযুক্তরা সকলেই সরকারি দলের। আজ লোকে বলছে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হলে, পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনদের সম্মান রক্ষা করতে হলে এই শাসককে বিদায় দিতে হবে। আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের লোভে নয়, ঘরের লক্ষ্মীর মান বাঁচাতে পরের ভোটটা বুঝে শুনে দিতে হবে। এই সরকারটা উলটে দিতে হবে। এক ভদ্রলোক মজা করে বলছিলেন 'রুটি আর সরকার, দুটোই মাঝে মাঝে উলটানো দরকার। রুটি না উলটোলে রুটি পুড়ে যায়, আর সরকার না উলটোলে জনগণ পুড়ে যায়'। এখন আর রাত দখল, দিন দখল, রাস্তা দখলে হবে না। সমাধান একটাই— নবান্ন দখল। সরকার বদল। সেটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই করতে হবে। তাড়াতে হবে এই মহিলাকে, সপার্ষদ, ওই গ্যাংস্টার ভাইপো সমেত। নইলে দু' তিন মাস অন্তর রাত জাগতে হবে, লাভের লাভ কিছু হবে না। □

সন্ত্রাসবাদের লালন, পাকিস্তানের মতো দশা হবে কানাডারও

প্রণবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

ট্রুডোর পরে এবার কার্নি! কানাডায় চলছে সন্ত্রাসবাদের লালন। এই মুহূর্তে উত্তর আমেরিকার এই দেশটিতে কম-বেশি ৬টি জঙ্গিগোষ্ঠী সক্রিয়। তার মধ্যে কয়েকটিতে নিয়মিত অর্থায়ন করে চলেছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। বাকি গোষ্ঠীগুলিও নানাভাবে জোগাড় করছে অর্থ। কার্নির আগে কানাডার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জাস্টিন ট্রুডো। সরকার বাঁচানোর বাধ্যবাধকতার জেরে তিনি লালন করেছিলেন সন্ত্রাসবাদকে। ভারত কিংবা বিশ্বের অন্যান্য দেশে যেসব গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তারা দিব্যি সুখে রয়েছে কানাডার মাটিতে। ট্রুডো সরকারের পতনের পর কানাডায় প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেছেন মার্ক কার্নি। তিনিও রাশ টানেননি সন্ত্রাসবাদে। তাঁর জমানায়ও চলছে সন্ত্রাসবাদের রমরমা। কানাডায় দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় খালিস্তানপন্থী বেশ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন।

এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরানো হলো 'বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল'। ভারতীয় ইউএপিএ আইনে নিষিদ্ধ এই জঙ্গি সংগঠন। ১৯৮১ সাল থেকে এই সংগঠনটি কানাডা থেকেই পরিচালিত হচ্ছে। পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এই সংগঠনে অর্থায়ন করে। ১৯৮৫ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার 'কণিষ্ক' বিমানে বোমা হামলার নেপথ্যে ছিল এই সংগঠনই। এই সংগঠনটিই হত্যা করেছিল পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বিয়ন্ত সিংহকে। এর প্রধান নেতা ওয়াধব সিংহ বব্বর বর্তমানে পাকিস্তানে বসবাস করছে।

ভারতীয় ইউএপিএ আইনে নিষিদ্ধ 'আন্তর্জাতিক শিখ যুব ফেডারেশন'ও। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি ও কানাডায় এদের শাখা রয়েছে। সেই সব দেশ থেকেই

> **কানাডার জঙ্গি সংগঠনগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করা উচিত কার্নি সরকারের। কারণ বর্তমানে যে বিষবৃক্ষের চারা তারা পালন করছে, সেই গাছে ফল ধরলে কিন্তু কানাডার হাল হবে পাকিস্তানের মতোই।**

পরিচালিত হয় এইসব সংগঠনের কাজকর্ম। এদের মূল লক্ষ্য হলো 'খালিস্তান' গঠন করা। এই সংগঠনকে টাকা জোগায় কানাডার বাসিন্দা জঙ্গি মানবীর সিংহ দুহদা। খালিস্তানপন্থী আর একটি গোষ্ঠী হলো 'শিখ লিবারেশন ফ্রন্ট'। ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি এর কার্যকলাপের ওপর সবসময় নজর রাখে। বর্তমানে এর কাজকর্ম পরিচালনা করে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের বাসিন্দা মনিন্দর সিংহ বুয়াল। ভারতীয় ইউএপিএ আইনে নিষিদ্ধ 'খালিস্তান জিন্দাবাদ ফোর্স'ও। এরা মূলত অনলাইনের মাধ্যমে শিখ যুবকদের খেপিয়ে তোলে এবং তাদের দিয়ে ভারতে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ধারাবাহিকভাবে সন্ত্রাসবাদের প্রচার করে চলেছে 'শিখস ফর জাস্টিস'। এর প্রতিষ্ঠাতা গুরপতবন্ত সিংহ পান্নু। এর কাজকর্ম পরিচালিত হয় আমেরিকা থেকে। ইউএপিএ আইনে ভারত সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এই সংগঠনকেও। এরা প্রায়ই ভারতের মানচিত্র বিকৃত করে এবং ভারতীয় নেতাদের হত্যার হুমকি দেয়।

হিংসার মাধ্যমে খালিস্তান গঠনের লক্ষ্যে জন্ম হয়েছিল 'খালিস্তান কমান্ডো ফোর্সে'র। এর নেতা ছিল পরমজিৎ সিংহ পঞ্জওয়ার। একাধিক জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে এই সংগঠনের।

কানাডায় মাথা তুলেছে ভারতে নিষিদ্ধ

আরও একটি খালিস্তানপন্থী জঙ্গি সংগঠন। এটি হলো 'খালিস্তান টাইগার ফোর্স'। এর প্রতিষ্ঠাতা জগতার সিংহ তারা। এক সময় সে ছিল বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের সদস্য। পরে গড়ে নিজস্ব সংগঠন। ১৯৯৫ সালের ৩১ আগস্ট পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বিয়ন্ত সিংহকে হত্যার ঘটনায় জড়িত এই জগতার সিংহ হবাড়া। ২০১৫ সালে থাইল্যান্ড থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।

খালিস্তানপন্থী এই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিই কানাডায় নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসে চালিয়ে যাচ্ছে ভারত-বিরোধী কাজকর্ম। এই যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা করল এই সব জঙ্গি গোষ্ঠীরই কেউ কেউ।

জি-৭ সম্মেলনে যোগ দিতে দু'দিনের কানাডা সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কার্নি সরকারের আমন্ত্রণে ওই সম্মেলনে তিনি গিয়েছিলেন অতিথি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে। প্রধানমন্ত্রী কানাডার মাটিতে পা রাখার পরেই আন্দোলনের নামে 'নোংরামি' করতে শুরু করে কানাডার জল-হাওয়ায় আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাওয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী একাধিক খালিস্তানপন্থী সংগঠন।

কানাডার অ্যালবার্টায় বসেছিল জি-৭-এর শীর্ষ বৈঠক। গত ১৬ জুন সেখানেই যোগ দিতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে ক্যালগেরি শহরে প্রতিবাদ র‍্যালি করে খালিস্তানপন্থী নেতারা। বিক্ষোভের সেই ছবি ভাইরালও হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাতে দেখা যাচ্ছে, বিক্ষোভকারীরা আপত্তিজনকভাবে 'মোদীকে হত্যা করো' স্লোগান দিচ্ছে। ভারতের জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলছে। এদিন বিক্ষোভকারীরা ক্যালগেরি সিটি হলের বাইরে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হয়েছিল। তারা খালিস্তানপন্থীদের ঝান্ডা ওড়াচ্ছিল। পোস্টারগুলিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিন্দে করা হয়েছিল। একটি পোস্টারে তাঁকে হাতকড়া পরা অবস্থায় এবং অন্যটিতে জেলের ভেতরে দেখানো হয়। পোস্টারের নীচে লেখা— 'আমি নিজ্জরকে হত্যা করেছি, যিনি একজন কানাডিয়ান নাগরিক।'

ওই বিক্ষোভে অংশ নেয় 'শিখস ফর জাস্টিসে'র একশোরও বেশি সদস্য। সংগঠনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বকশিস সিংহ সান্ধু বলে, 'কানাডায় মোদীর উপস্থিতি ছিল ভারতকে দায়ী করার একটি সুযোগ।' খালিস্তানি গণভোটের বিষয়ে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সে জি-৭ নেতাদের আহ্বানও জানায়। তার দাবি, এটি পঞ্জাবের ওপর কথিত দখলদারিত্ব শেষ করার একটি পদক্ষেপ।

অন্য একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে ভারতকে অপমান করতে খালিস্তানপন্থীরা লেলিয়ে দিয়েছে শিশুদের। তারা ভারত বিরোধী প্রচার করছে। অবমাননা করছে ভারতের জাতীয় পতাকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবিতে লাথি মারতেও দেখা গিয়েছে কয়েকজন নাবালককে। ভিডিয়োর ছবি থেকেই স্পষ্ট, খালিস্তানপন্থীরা ফ্রেমের বাইরে দাঁড়িয়ে শিশুদের উৎসাহিত করছে ভারতীয় পতাকা ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর ছবিকে অপমান করতে। সব মিলিয়ে মোট ৬ জন শিশু এই ঘটনায় জড়িত ছিল।

অন্য একটি ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা গিয়েছে, খালিস্তানপন্থী এক উগ্রপন্থী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যা করার শপথ নিচ্ছে।

কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের এহেন আচরণে যারপনাই ক্ষুব্ধ ভারতে বসবাসকারী শিখরা। বিজেপি শিখ নেতা মঞ্জিন্দর সিংহ সিরসা বলেন, 'কানাডায় যা ঘটছে, যেখানে শিখ শিশুদের ঘৃণা ছড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা দেখে প্রতিটি শিখ গভীরভাবে ব্যথিত ও লজ্জিত।' তিনি বলেন, 'এটি অত্যন্ত অবাক করার মতো ঘটনা। কীভাবে কিছু লোক রাজনৈতিক স্বার্থে ছোটো ছোটো শিশুদের ব্যবহার করছে। তাদের এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, যা তালিবানি প্রোপাগান্ডার মতো মনে হচ্ছে।' সিরসা বলেন, 'বিশ্ববাসীর কাছে এটি শিখ শিশুদের ভুলভাবে উপস্থাপন করছে এবং তাদের মনে ঘৃণা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ফলে গোটা বিশ্বের চোখে শিখদের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। আমাদের চরমপন্থী হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এটি সম্পূর্ণভাবে গুরু গ্রন্থ সাহেবজী-র শিক্ষার এবং শিখ পন্থের মূলনীতির বিরোধী। এই পন্থ আলাপ আলোচনাও মানবসেবার ওপর জোর দেয়।'

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-টেররিস্ট ফ্রন্টের সভাপতি মনিন্দরজিৎ সিংহ বিট্টা বলেন, 'যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করা হয়, তখন কীভাবে ভারতের শিখ সম্প্রদায় নীরব থাকে?' আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ হরভজন সিংহ বলেন, 'আমি মনে করি আজকাল যা কিছু ঘটছে বিশেষ করে বাচ্চারা যা করছে, তার অনেক কিছুই তারা নিজেরাই বুঝতে পারে না। তাই এটা আমাদের, মানে বড়োদের এবং পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় যে তাদের বুঝিয়ে বলা আসলে কী ঘটছে। যা ঘটেছে, তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।' তক্ত শ্রীহরমন্দির সাহিবের সেক্রেটারি, হর সিংহ বলেন, 'এটি দেখে ও শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। যা ঘটেছে, আমরা তা সমর্থন করি না। আজ প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের জন্য যা করছেন, তিনি তাঁর নেতৃত্বের মাধ্যমে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন।'

সর্দার ত্রিলোচন সিংহ বলেন, 'এরা অন্য একটি দেশের শিশু, যাদের ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছে এবং তারা ভারতের মানুষের অনুভূতিকে উসকে দিচ্ছে। তাদের 'ব্রেনওয়াশ' করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। কানাডা সরকারকে এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদীজীকে এভাবে অপমান করা একেবারেই ঠিক হয়নি। তিনি শিখ সম্প্রদায়, দেশ ও বিশ্বের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।'

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, কানাডার এই ঘটনার (ভারত ও প্রধানমন্ত্রীকে অপমান) পর জঙ্গি সংগঠনগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করা উচিত কার্নি সরকারের। কারণ বর্তমানে যে বিষবৃক্ষের চারা তারা পালন করছে, সেই গাছে ফল ধরলে কিন্তু কানাডার হাল হবে পাকিস্তানের মতোই। ভারতে টাইট দিতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদে মদত জুগিয়ে চলেছে পাকিস্তান। নানা সময় সেই সন্ত্রাসবাদের বলি হয়েছেন নিরীহ পাক নাগরিকরাও। □

ত্রিপুরার পর পশ্চিমবঙ্গে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

শিক্ষকের কান্নায় কি ডুববে মমতার সিংহাসন?

দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের প্রাপ্য ঘৃণা, বিরূপ মনোভাবে অংশীদার শিক্ষকরা হবেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অবাক হতে যখন দেখি, যে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে সেই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গেও শিক্ষকদের একটা বড়ো অংশ রয়েছেন। ভালোভাবে রয়েছেন। প্রকাশ্যে রয়েছেন।

সাধন কুমার পাল

ত্রিপুরায় তখন রক্তমাখা লাল রাজত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে ছিলেন সিপিএমের মানিক সরকার, যিনি পরিচিত ছিলেন 'সাদামাটা মুখ্যমন্ত্রী' নামে। ২০১০ ও ২০১৩ সালে বাম সরকারের আমলে ১০ হাজার ৩২৩ জন শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছিল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া ঘিরে একের পর এক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হন কিছু প্রার্থী। আগরতলা হাই কোর্ট চাঞ্চল্যকর রায় দেয়— 'পুরো প্যানেল অবৈধ, বাতিল করতে হবে।' সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় তৎকালীন সরকার। কিন্তু ২০১৭ সালে দেশের সর্বোচ্চ আদালতও হাইকোর্টের সিদ্ধান্তেই সিলমোহর দেয়। এই রায়ের ঢেউ রাজনীতির ময়দানেও পড়ে। পরের বছর বিধানসভা ভোটে ক্ষমতা হাতছাড়া হয় মানিক সরকারের।

২০২৫ সালের ৩ এপ্রিল, সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের নিয়োগকে 'বেআইনি' আখ্যা দিয়ে বাতিল করে দেয়। ২০২৪ সালের এপ্রিলে কলকাতা হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট কার্যত তাই-ই বহাল রাখে। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় ঘোষণা করে। ঠিক এমন এক সময় এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, যখন সামনে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোট। ইতিহাসের পাতায় যদি ত্রিপুরার ১০ হাজার ৩২৩ নিয়োগ বাতিল এবং তার রাজনৈতিক প্রভাবকে বিবেচনায় আনা হয়, তাহলে প্রশ্ন জাগে, এই রায় কি তৃণমূল সরকারের জন্য অশনিসংকেত? এই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে লুকিয়ে রয়েছে। তবে তার আগে কিছু বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন জাগে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখেও সমাজের বিবেক জাগ্রত হলো কি? আরজি করের অভয়ার মৃত্যুর জেরে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন সমাজকে যতখানি নাড়িয়েছিল, শিক্ষকদের আন্দোলন তার এক শতাংশও প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে কি? শিক্ষকরাও দিনের পর দিন, রাতের পর রাত খোলা আকাশের নীচে কাটিয়ে অবস্থান করলেন, অর্ধনগ্ন হয়ে প্রতিবাদী মিছিল সংঘটিত করলেন, অনশন করে গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলেন, জেলা শহরগুলোতে ডিআই অফিস ঘেরাও করলেন, পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করল, তবুও সমাজে কোনো প্রভাব পড়লো কি? শুধু কী তাই, যেসব শিক্ষকরা চাকরিতে বহাল রয়েছেন, যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের এই চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা পড়িয়েছেন তারা এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যেও কি তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেকেই হয়তো মাথা চুলকোবেন। তাহলে কি বলতে হবে যে সমাজটাই অসংবেদনশীল, স্বার্থপর? ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগরদের নিয়ে নিস্পৃহ? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার।

যে দেশে ভারতীয় সমাজে শিক্ষক-শিক্ষিকারা গুরু বলেই পূজিত হতেন। সামাজিক অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কেরও অবক্ষয় হয়ছে, এটা সত্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বাম জমানায় শিক্ষক সমাজের প্রতি মানুষের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির ইতিহাস রয়েছে।

বাঘকে রক্তের স্বাদ পাওয়ানোর মতো শিক্ষক সমাজকে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ পাইয়ে দিয়ে নিজেরা ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করেছিল বামপন্থীরা। বাম জমানায় মানুষ দেখেছে একশ্রেণীর শিক্ষক পার্টির নেতা হয়ে দিনের পর দিন স্কুলে না গিয়ে বেতন তুলেছেন। সমস্ত রকম অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের ধারা নামিয়ে এনেছেন। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে কুৎসা, অশ্রাব্য ভাষায় বিরোধীদের

গালাগালি করা, হার্মাদদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিছিল করা, সমস্তই মানুষ এই শিক্ষকদের করতে দেখেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। একশ্রেণীর শিক্ষক হার্মাদ তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও শিক্ষক সমাজের সিংহভাগ এসব দেখেও চুপচাপ থেকেছেন, কোনো প্রতিবাদ করেননি। সিংহভাগ শিক্ষক- শিক্ষিকাই পার্টির মিছিলে হেঁটে ঝান্ডাবহন করে ঝুট ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে নিজেদের জীবনকে নিশ্চিন্ত করার জন্য যা যা করার সবই করেছেন। বছরের পর বছর ধরে শিক্ষকদের মধ্যে মানুষ এই নৈতিক অধঃপতন দেখেছে। শিক্ষকদের এই অধঃপতনের ধারা তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা নিয়ে মিছিল মিটিং করার এই প্রবণতা বাম আমলের চাইতেও বেশি। ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকুরি গেল, এর মধ্যে অনেকেই যোগ্য ছিলেন। এই যোগ্য শিক্ষকদের প্রতি বর্তমান সরকার যে অন্যায় করেছে, এর কোনো ক্ষমা হয় না। কিন্তু এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেও বৃহত্তর শিক্ষক সমাজ গর্জে উঠলো কোথায়? এরপরেও দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষকরা চাকরিতে বহাল রয়েছেন তারা ঠিক আগের মতোই ঝুটঝামেলার ভয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তাঁবেদারি করে যাচ্ছেন। তৃণমূল শিক্ষা সেলের সদস্য হয়ে বহাল তবিয়তে আছেন। নিজের সহকর্মীর এই দুর্দশা দেখেও তাদের মধ্যে কোনো চেতনা আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষকদের এই অবস্থা দেখে সেই কসাইখানার দৃশ্যই মনে পড়ে যায়। যেখানে একদিকে কসাই একটিকে ধরে ধরে আড়াই প্যাঁচ দিচ্ছে আর অন্যদিকে পাশে বেঁধে রাখা ছাগলগুলো নিশ্চিন্ত মনে ঘাস চিবুচ্ছে। নির্বাচনের সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিয়ে ভোট করানো হয়। শিক্ষকমহলেও কান পাতলেও শোনা যায় ভোটের নামে যা কিছু হোক আমরা নিরাপদ থাকলেই হলো। যা ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে তাতে হয়তো ভোটকর্মীদের খুব বেশি কিছু করার থাকে না। কিন্তু ভোটকর্মী হিসেবেও শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে কোনোরকম প্রতিবাদী মানসিকতা দেখা যায় না। অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থা জাহান্নামে যাক, আমি নিরাপদ থাকলেই সব ঠিকঠাক আছে এই মানসিকতা পেয়ে বসেছে বর্তমান শিক্ষক সমাজকে। একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতার ভিতর থেকে শিক্ষক সমাজের আচার-আচরণ এই প্রতিবেদক প্রত্যক্ষ করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনো কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দিইনি। ভোট নিতে গিয়েও হাজার চাপেও কখনো মাথা নত করিনি। কিন্তু সহকর্মীদের অনেককেই দেখেছি ভোটকেন্দ্রে অনৈতিক কিছু দেখেও এক মানসিক প্রশান্তি নিয়ে ভোট করিয়ে বাড়িতে ফিরছে, 'আমি তো নিরাপদ আছি'। মনে হতে পারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি হারানোর সঙ্গে এইসব ঘটনার সম্পর্ক কী? সম্পর্ক আছে, ২৬ হাজার শিক্ষক- শিক্ষিকার চাকরি যাওয়ার মতো এত বড়ো ঘটনা— সমাজ উদাসীন! শিক্ষা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে— সমাজ উদাসীন!

হাইকোর্টের রায়ে যখন ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি গেল সেই সময় তারা অরাজনৈতিক শিক্ষক সংগঠন ABRSM-এর ডাকে সাড়া দেয়নি। তৃণমূল নিয়োজিত একদল দালাল আইনজীবীর খপ্পরে পড়ে বকলমে তৃণমূলের প্লাটফর্মেই ওই চাকরি যাওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকারা সুপ্রিমকোর্টে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে সময় ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল যে ওদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হয়ে আছে যে মমতা ব্যানার্জি যেভাবেই হোক ওদের চাকরিটা বাঁচিয়ে রাখবেন।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্ট প্রথম ২৫ হাজার ৭৫২ জনের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেদিন হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই রায়কে অবৈধ বলে সুপ্রিমকোর্টে যাওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। পরে সেই আদেশের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্টে আপিল করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যের চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান এসএসসি। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'এখন তো এখানকার বিচারালয় বিজেপির বিচারালয় হয়ে গেছে। দিল্লির বিজেপির দপ্তরের নির্দেশে বিচারক নিয়োগ হয়। বিচার হয়। আমরা আজকের রায়কে অবৈধ মনে করি। আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে যাচ্ছি।'

মমতা আরও বলেন, 'ওরা জেলে পাঠাবে, আমি তৈরি। আমি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করছি। আমি চাকরিহারাদের পাশে আছি। যতদূর যেতে হয় যাব। আমি তৈরি।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া দেখে চাকরি হারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা ধরে নিয়েছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী এক নম্বরি বা দু' নম্বরি যেকোনো উপায়েই হোক চাকরিটা বাঁচিয়ে দেবেন। স্বভাবত মিথ্যেবাদী মুখ্যমন্ত্রীর হাবভাব দেখে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে সেই সময়ে খুব বড়ো বেশি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। মামলা লড়ার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তৈরি হয়েছিলেন তবে কিছু ছদ্মবেশী আন্দোলনকারীর ফাঁদে পড়ে তৃণমূলের ছাঁচেই ওরা সুপ্রিমকোর্টে আইনি লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেসময় চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মমতা ব্যানার্জির সুরেই বলতে শোনা গেছে সবটাই বিরোধীদল শুভেন্দু অধিকারী, সিপিএমের বিকাশ ভট্টাচার্য এদের চক্রান্তের জন্যই আজ এই পরিস্থিতি। সেজন্যই রাজনীতির স্বার্থেই মমতা ব্যানার্জি তাঁদের রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস তাঁদের মনের দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিল। এই শিক্ষক-শিক্ষিকারা যে সবাই তৃণমূলপন্থী তা কিন্তু নয়। তবে যে পন্থীই হোক কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই বিশ্বাস করতেন মমতা ব্যানার্জি অনৈতিক পথে হলেও তাঁদের চাকরিটা বাঁচিয়ে দেবেন।

সুপ্রিম কোর্টের রায় বের হওয়ার পরেও তৃণমূল থেকে ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল সংসদে সদ্য পাশ হওয়া ওয়াকফ বিলের প্রভাব থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে নাকি প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে ২৬ হাজারের চাকরি ছিনিয়ে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থাৎ এই চাকরি হারানোর পেছনে কলকাঠি নেড়েছে সেই বিজেপিই। ঠিক এই ন্যারেটিভকেও সমর্থন করতে দেখা গেছে চাকরিহারা শিক্ষক- শিক্ষিকাদের। এরপরে যত দিন গেছে ওদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে মমতা ব্যানার্জি ওদের বাঁচাবেন না, মমতা ব্যানার্জি রয়েছেন অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে, যোগ্যদের সঙ্গে নয়। সমস্ত কিছু হারিয়ে এখন অনেকেরই জ্ঞানচক্ষু খুলেছে, কিন্তু এখন করার কিছুই নেই।

সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে সমাজ এমনি এমনি জাগেনি, সামাজকে জাগাতে হয়েছে। তাতেও শিক্ষক সমাজের বুকে প্রতিনিয়ত শিক্ষক শিক্ষিকারা লাঞ্ছিত হচ্ছেন, নির্যাতিত হচ্ছেন, সমাজ মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের হাতের পুতুল হয়ে শিক্ষক সমাজ নিজেদের জীবন অতিবাহিত করছে। স্বাভাবিকভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের প্রাপ্য ঘৃণা, বিরূপ মনোভাবে অংশীদার শিক্ষকরা হবেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে সেই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গেও শিক্ষকদের একটা বড়ো অংশ রয়েছেন। ভালোভাবে রয়েছেন। প্রকাশ্যে রয়েছেন। এই দলের অপকর্মের দায় শিক্ষক সমাজকেও নিতে হবে। ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরি হারিয়ে তারই মাশুল গুনছেন। তবে আশার কথা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখনো আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। এটা একটা বড়ো পরিবর্তন। এই পরিবর্তনকে হাতিয়ার করে শিক্ষকদের ওপর সমাজের অনাস্থা যে পরিমাণেই থাকুক না কেন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা-সহ এই রাজ্যকে বাঁচাতে গেলে এই সর্বনেশে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে রাজ্য ছাড়া করতে হবে। না হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য কোনো কিছুই নতুন করে কিছু গড়ে ওঠার সুযোগ থাকবে না। সেজন্য মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। □

কসবা ল' কলেজের গণধর্ষণের ঘটনা বাঙ্গালির কলঙ্ক

আনন্দ মোহন দাস

দেখা গেছে সমাজে যখন মাতৃজাতির উপর অত্যাচার ও অনাচার বাড়তে থাকে তখনই তার পতন ঘটে। মহাভারত ও রামায়ণের যুগেও দ্রৌপদী ও সীতার অপমানের পরিণামের কথা সকলেরই জানা আছে। এর ফলে রাবণবংশ ও কৌরবকুল ধ্বংস হয়েছিল। সেই দিকেই কি পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলেছে? রাজ্যে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে। কারণ রাজ্যে লাগামছাড়া প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির জন্য অপরাধীরা নারীধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের মতো জঘন্য ও নারকীয় ঘটনা ঘটাবার সাহস করছে। সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কসবা 'ল' কলেজ ক্যাম্পাসে শাসকদলের মদতপুষ্ট ছাত্র নেতাদের দ্বারা ছাত্রীকে গণধর্ষণ বাঙ্গালি সমাজের কলঙ্ক। এমনকী ধর্ষিতাকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য একজন অভিযুক্ত ধর্ষণের ভিডিয়ো পর্যন্ত করেছে। কত বড়ো দুঃসাহস থাকলে এই ধরনের নোংরা কাজ এরা করতে পারে! অভিযুক্ত ছাত্র নাকি বলছিল, ইউনিয়নের পদ পেতে গেলে কম্প্রোমাইজ করতে হবে, তার প্রতি লয়্যাল থাকতে হবে।

কলেজের সম্পাদক পদের জন্য যদি ধর্ষণের শিকার হতে হয়, তাহলে নারী সম্মান কোথায় নেমেছে এই রাজ্যে? কলেজে ছাত্রীদের নিরাপত্তা কোথায়? মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন নারী ও পুলিশ মন্ত্রী হয়ে নারী সুরক্ষার জন্য দায়ী নয় কি? নারী শিক্ষা ও সুরক্ষা সরকারের মৌলিক কর্তব্য নয় কি? দশমাস আগেও এই রাজ্যে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করার ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে, যা সারা বিশ্বে লজ্জায় বাঙ্গালির মাথা হেঁটে হয়েছে। তারপরও খোদ রাজধানী কলকাতা শহরের বুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবার গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে গেল।

কসবা ল' কলেজের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাসকদলের সঙ্গে যোগ থাকার কথাও সংবাদপত্রে এসেছে। এর ফলে কলেজে এদের দাদাগিরি চলতো। ইতিপূর্বে অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের নামে বিভিন্ন থানায় মোট ১১টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং এর মধ্যে

৪টি শ্লীলতাহানির মামলাও রয়েছে। মামলাগুলির নিষ্পত্তি হলো কিনা বা শাস্তি হলো কিনা সবকিছুই অজানা। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যার বিরুদ্ধে এতো ফৌজদারি মামলা, দল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি কেন?

এমনকী মনোজিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, পিকনিকে গিয়ে কলেজের ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি করাও তার অভ্যাসে ছিল। এই মনোজিৎ মিশ্র গ্যাঙের ভয়ে ছাত্রীরা সর্বদা আতঙ্কে থাকতো। প্রশ্ন ওঠে, এত অভিযোগের পরেও সে কীভাবে এই কলেজে চাকরি পায়। তাহলে কি শাসকদলের কৃপাদৃষ্টি রয়েছে? জানা গেছে, কলেজে বছরে ১০-১৫টি আসনে ভর্তির জন্য নাকি অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের কোটা রয়েছে এবং পিছনের দরজা দিয়ে ভর্তির জন্য মাথাপিছু ৫০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে সে নিত। এর ফলে সে বছরে সর্বনিম্ন ৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৪৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করতো। এই অর্থবলই নাকি তার পাশবিক শক্তির আস্ফালনের রসদ।

সাধারণত আইন কলেজে ভর্তির জন্য পরীক্ষায় ৫০০-এর মধ্যে র‍্যাঙ্ক করলেও মনোজিৎ মিশ্রের মাধ্যমে টাকার বিনিময়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব হতো। শাসকদলের মদত ছাড়া সে এই ধরনের বেআইনি কাজ করার ছাড়পত্র পায় কী করে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত কয়েক মাসের ব্যবধানে দুটি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটে গেল। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন দিকে নারী ধর্ষণের ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে এবং শাসকদলের সঙ্গে যোগ থাকলে দুষ্কৃতকারীরা বহাল তবিয়তে ঘুরতে থাকে। এদের সাহস ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং পুলিশ তাদের অঙ্গুলিহেলনে চলবে এই বিশ্বাস জন্মাতে থাকে।

রাজ্যে দীর্ঘদিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নির্বাচন হয়নি। এখানে শেষ নির্বাচন হয়েছিল ২০১৭ সালে। কাগজে কলমে ইউনিয়ন না থাকলেও পিছনের দরজা দিয়ে শাসকদলের মদতপুষ্ট ছাত্রনেতারা বকলমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইউনিয়নের ক্ষমতা অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। এমনকী প্রাক্তন ছাত্ররাও কলেজে শাসকের মদতে দাদাগিরি বজায় রেখেছে। কসবা কলেজে অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র ২০২২ সালে পাশ করে গেছে। এর পরেও কলেজে তার মাতব্বরি বজায় রেখেছে। তার ফলে কলেজ প্রশাসন স্বাধীনভাবে কলেজ চালাতে পারেন না এবং বিনা বাধায় ক্যাম্পাসের মধ্যে অবৈধ কাজকর্মের রমরমা চলে। শাসকদলের হুমকিতে অন্যান্য ছাত্র ইউনিয়নগুলির কলেজে সংগঠন করার অধিকার না থাকায় শাসকদলের ছাত্র ইউনিয়নের একচেটিয়া আধিপত্য বজায় থাকে। এর ফলে ছাত্রীদের নিরাপত্তা ও সম্ভ্রম নিয়ে এরা ছেলেখেলা করে। রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নারী সুরক্ষা প্রায় নেই বললেই চলে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অসামাজিক কাজের আখড়া করে রেখেছে। সেজন্য প্রায়শঃ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী লাঞ্ছনা, যৌন নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটতে থাকে। অনেক জায়গায় এই ধরনের যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও তা প্রকাশ্যে আসে না। এর আগেও নাকি এই কলেজে শারীরিক শোষণ হয়েছে। অনেক মেয়েরা লোকলজ্জায় সামনে আসতে পারেন না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও এই ধরনের অপসংস্কৃতির কবলে পড়েছে।

যে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায় দেশকে পথ দেখাত, তার আজ এই অবস্থা। যে বঙ্গে এক সময় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নারী প্রগতিতে দেশকে এগিয়ে রাখত, সেখানে আজ আরজি কর ও কসবার কলেজের মতো ঘটনা ঘটছে। শাসকদলের ভয়েই কি বাঙ্গালি বিদ্বৎ সমাজ আজ প্রতিবাদ বিমুখ হয়েছে? কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, শাসকদলের সঙ্গে এরাই উন্নাও, হাথরসের ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে। তাহলে এ ক্ষেত্রে চুপ কেন?

স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণধর্ষণের ফলে অভিভাবকরা নিজেদের মেয়েকে কলেজে পাঠাতে দ্বিধাবোধ করবেন। মেয়েদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। তাই সুশীল সমাজকে এই অনাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে। শাসক দলের মদতপুষ্ট কিছু ছাত্রের কুকাজের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে গর্জে উঠতে হবে। নতুবা রাজ্যে নারী শিক্ষা রসাতলে যাবে। এত ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটার পরেও শাসকদলের কিছু নেতা কথাবার্তায় নারী বিদ্বেষী আচরণ করছেন। সুতরাং নারীদের প্রতি কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী তা শাসকদলের নেতাদের আচরণেই বোঝা যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের নারীরা আজ অসহায়। শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা নারীজাতির উপর নিরন্তর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এরাই নির্বাচনে শাসকদলের পক্ষে ভোট লুঠের কারিগর। সেজন্য এদের অপরাধমূলক কাজের শাস্তি হয় না। অনেক সময় এদের বিরুদ্ধে পুলিশ এফআইআর পর্যন্ত নেওয়ার সাহস করে না। সেই কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও রাজ্যে এই ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। ইতিমধ্যে সামনে এসেছে সন্দেশখালির শেখ শাজাহানের মতো শাসকদলের নেতারা পিঠে বানাবার নাম করে রাতের বেলায় পার্টি অফিসে মা-বোনেদের তুলে নিয়ে গিয়ে যৌনশোষণ করে। জেলায় জেলায় শাসকদলের অনেক শেখ শাজাহান রয়েছে, যারা এই ধরনের কুকাজে অভ্যস্ত। প্রত্যেকদিন সংবাদপত্রের পাতায় রাজ্যে নারী ধর্ষণ ও নির্যাতনের সংবাদ রয়েছে এবং নারীদের সুরক্ষা তলানিতে ঠেকেছে। এখানেই কামদুনি, পার্ক স্ট্রিট, ক্যানিং, কালিয়াচকের মতো ঘটনা ঘটেছে। বামেদের ৩৪ বছর রাজত্বেও এই ধরনের ঘটনা অনেক ঘটেছে। সিপিএমের আমলে বানতলার মতো জঘন্য নারকীয় ঘটনার উদাহরণ রয়েছে। বামেরা এই রাজ্যে রক্তবীজের চাষ করে গেছে। মমতা ব্যানার্জি তাকে লালনপালন করে বড়ো করে তুলছেন। বাঙ্গালির সম্মানটুকু আজ সারা দেশে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী সমাজের একটি সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান রয়েছে। শাস্ত্র বলছে, 'মাতৃবৎ পরদারেষু' অর্থাৎ অন্যের স্ত্রীকে আমরা মায়ের মতো দেখি। নারীকে আমরা দেবীরূপে কল্পনা করি। নারীজাতির প্রতি এটাই আমাদের দৃষ্টিকোণ। হিন্দু বিরোধী শক্তি সেই সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করে চলেছে। সেই কারণে এই রাজ্যে নারী শক্তির প্রতি পাশবিক অত্যাচার বেড়ে চলেছে। নারীর সম্মান রক্ষা করতে না পারলে সমাজ ধ্বংস হবে এবং দানবীয় শক্তির প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। তাই এই ধরনের নারকীয় ঘটনার বিরুদ্ধে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের প্রয়োজন রয়েছে। □

সাবধান! শুরু হয়েছে চিকিৎসা জিহাদ

শুভায় সাও

বিষ বিষ আর বিষ। ঘৃণাই কি তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য? এমন ঘৃণা যাতে তারা যে কোনো নিরীহ নির্দোষ মানুষের প্রাণনাশ করতে পারে? এটাই বর্তমানে সারা বিশ্বের জিজ্ঞাসা। আপনি চিকিৎসার কারণে কোনো হাসপাতালে গেছেন আর সেখানকার চিকিৎসক বা নার্স আপনার জীবনের শত্রু শুধুমাত্র এই কারণে হয়ে যায় যে আপনি সেই চিকিৎসক বা নার্সের সমধর্মী নন, আপনি কোনো ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা আপনি সেই চিকিৎসক বা নার্সের শত্রু দেশের নাগরিক। যে ডাক্তার বা নার্সের কাজ মানুষের প্রাণ বাঁচানো, সেই ডাক্তার বা নার্স যদি আপনার প্রাণনাশের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে কী হবে? তাও ধর্মের ভিত্তিতে বা ঘৃণার ভিত্তিতে? এমনই আশ্চর্যচকিত করে দেবার মতো, ভয় পাইয়ে দেবার মতো আজব এক ঘটনা ঘটেছে অস্ট্রেলিয়াতে, যা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সেখানে একটি ভিডিয়ো প্রকাশিত হয়েছে যাতে দেখা যাচ্ছে মাক্সভেইফার নামক একজন ইহুদিকে ব্যাঙ্কসটাউন লিডকম্ব হাসপাতালের এক মুসলমান ডাক্তার এবং একজন নার্স বলছে যে তারা সেই ইহুদির চিকিৎসা করবে না। তাকে বলছে— 'তোর ধারণা নেই যে এই হাসপাতালে কত ইজরায়েলি কুত্তা এসেছে আর আমি তাদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি এটা বলছি আমার ধর্মের ভিত্তিতে।' এই ভিডিয়ো অস্ট্রেলিয়াতে ডাক্তার ও নার্সের মতো সম্মানজনক পেশার উপরেও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। যাকে এরা চেনে না, জানে না, তার সঙ্গেও এরা শত্রুতা করবে? তাকেও এরা মেরে ফেলবে? কারণ সে শুধুমাত্র একজন বিধর্মী বলে। বুঝতে পারছেন ধর্মান্ধতা এদের কোথায় গিয়ে ঠেকেছে? ফলস্বরূপ এই ভিডিয়ো প্রকাশিত হবার পর অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা-সহ সারা বিশ্বে হইচই ফেলে দিয়েছে।

বিষয়টি এতটাই স্পর্শকাতর যে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টোনি অ্যালবানিজকে সংসদে এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে হয়। এই ভিডিয়ো অস্ট্রেলিয়াতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া পরিস্থিতি বা পরিবেশের হুঁশিয়ারি প্রমাণ করছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে তদন্ত আরম্ভ হয় সেই ডাক্তার ও নার্সের বিরুদ্ধে। ক্রিমিনাল কেস রুজ্জু করা হয়। সেইসঙ্গে তাদের সাসপেন্ড করা হয়। চিন্তা করুন, চিকিৎসার মতো অত্যন্ত সম্মানজনক পেশা, যাদের ভগবান রূপে দেখা হয়। যারা মৃতপ্রায় রুগিকে জীবনদান করেন। আর হাসপাতালের মতো সেই গৌরবময় স্থানকে, সেই গৌরবময় পেশাকেও এরা কলঙ্কিত করতে ছাড়ে না শুধুমাত্র তাদের মজহবি কারণে। এরকম চলতে থাকলে তো এরা হাসপাতালকে নরকে পরিণত করে ছাড়বে। পৃথিবীতে আর কোনো উপাসনাপদ্ধতিতে আজ পর্যন্ত এরূপ জঘন্য কার্যকলাপ কেউ দেখেছেন কি? এটা তো প্রকাশ্যে চলে এসেছে বলে আমরা জানতে পারলাম। কিন্তু এরকম যে আরও ঘটনা ঘটেনি তার নিশ্চয়তা কোথায়?

কিন্তু জানেন কি, এই দুই নার্সের সমর্থনেও অনেকে নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছেন? আর তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই দুই অভিযুক্ত— স্লাম সম্প্রদায়ের বলে। একজনের নাম আহমেদ রাশাদ নাদির এবং অপরজন সারা আবু লেদিক। আর মজার ব্যাপার হলো, যখন মিডিয়া এদের বাড়িতে পৌঁছয় এদের সাক্ষাৎকার নিতে, তখন এদের বাড়ির লোকেরা মিডিয়ার উপরেই চড়াও হয়। মিডিয়ার লোকের সঙ্গে মারপিট করে, এমনকী তাদের মোবাইল ফোন পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়। এরকমটি বিশ্বের আর কোনো রিলিজিয়নে দেখেছেন কি? এখানেই শেষ নয়, আহমেদ রাশাদ এবং সারা আবুর সমর্থনে অনেকে মুসলমান কার্ড খেলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ইসলাম ফোবিয়া এবং অ্যান্টি মুসলমান প্রোপাগান্ডার যুক্তি দিতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। রামিয়া সুলতান যিনি একজন আইনজীবী এবং অস্ট্রেলিয়াতেই তার উপার্জন ও জীবিকা নির্বাহ হয়, সেও এই দুই অভিযুক্তের সমর্থনেই রাস্তায় নেমে পড়েছে। তার বক্তব্য হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যেটা হচ্ছে সেটা খুব খারাপ। কিন্তু একবারের জন্যেও বলেনি যে প্রথমে ফিলিস্তিনিরা এই জঘন্য কাজ শুরু করেছে, সেগুলি নিন্দনীয় বা এই দুই নার্সিং যে কাজ করেছে সেটিও নিন্দনীয়।

অর্থাৎ যেখানে থাকবে, যেখানে খাবে, সেখানেই তার বিরোধিতা করবে। এটা শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, সারা বিশ্বে এদের এই চারিত্রিক নিদর্শন দেখা যায়। তাই তো আজ সারা বিশ্বে এরা শুধুমাত্র অবিশ্বাসের পাত্রই হয়ে উঠেছে। সারা বিশ্বে এদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। এদেরকে দাঙ্গাপ্রবণ সম্প্রদায় বলা হয়। একবার ভাবুন তো ঠিক এরকম ব্যবহার যদি এদের সঙ্গেও করা আরম্ভ হয়ে যায় তাহলে সারা বিশ্বের অবস্থা কী হবে? যদি অন্যেরা এরকমই বদলা নিতে আরম্ভ করে তাহলে কী হবে? পাকিস্তান, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ রুগির প্রাণ তো ভারতীয় ডাক্তাররা বাঁচান। ভারতীয়রা তো কখনো এরকম চিন্তা করেন না। যদিও পাকিস্তানি জেহাদিরা কত শত ভারতীয়র প্রাণনাশ করেছে। এর আগে পাকিস্তানে একবার এক হিন্দু নবজাতকের গলা কেটে ফেলা হয়েছিল। কারণ, সেই নবজাতকটি মুসলমান ছিল না।

এর আগে শ্রীলঙ্কাতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে মহিলা রোগীর প্রজনন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কারণ সেই মহিলারা মুসলমান ছিল না বলে। এরকমই একটি ঘটনা কিছুদিন আগে কর্ণাটক থেকেও শোনা গিয়েছিল। এরকম হামেশাই কোথাও না কোথাও ঘটে চলেছে। সবগুলি জানা যাচ্ছে না। কিন্তু আজব ব্যাপার, এদের নিজেদের সম্প্রদায়ের থেকে একজনও এইসবের প্রতিবাদ করে না, নিন্দা করে না। অথচ বলা হয় সবাই তো আর খারাপ নয়। সবাই যদি খারাপ না থেকে থাকে তাহলে তারা এই সকল খারাপ চিন্তাভাবনার প্রতিবাদ বা নিন্দা করে না কেন? তার মানে তাদেরও সায় রয়েছে। এই ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই দিকে সকলকে নজর রাখতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সারা বিশ্বে এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে হবে এবং মানুষকে সচেতন করতে হবে। ☐

ফঃ ৩

টাকা দিয়ে মৃত্যু কেনার রাজনীতি বন্ধ হোক

বিশ্বপ্রিয় দাস

মুখ্যমন্ত্রী আপনার লজ্জা হয় না? আবারো সেই পয়সা দিয়ে মৃত্যু কেনার প্রচেষ্টা? এই নোংরা খেলা কবে থামাবেন? আপনার বিধায়ক খাম নিয়ে গেলেন। শিশুটির মায়ের কাছে দু'থাপ্পড় খেলেন। আবার সাফাই গাইতে গিয়ে, ভুলভাল বকলেন। তারপর পালিয়ে এলেন। যেমন ভাবে আপনিও অভয়ার মায়ের কাছে থাপ্পড় খেয়েছিলেন। এর আগেও অবশ্য আপনার এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি। আপনি ভাবেন সবাই ভাতার ভিখারি। তামান্নার মা আপনার বিধায়ককে হাজারো বৈদ্যুতিন মাধ্যমের, সোস্যাল মিডিয়ার সামনে তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করলেন। সেটা কী অভিপ্রেত ছিল!

আপনি ভোটের আগে আবার সেই খেলায় নেমেছেন। যেমনটি পঞ্চায়েত ভোটে খেলেছিলেন। আগের থেকে গ্রামের নিরীহ মানুষদের বোমা, বন্দুকের ভয় দেখিয়ে ভোটের কেন্দ্রে যেতে দেননি। যেভাবে ভোটের আগের দিন আপনার বিরোধী দল যেখানে শক্তিশালী, সেখানে আপনার দলের দুষ্কৃতীরা বোমাবাজি করে ঘরে বন্দি করে রেখেছিল যাতে তাঁরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে না পারে। আপনার পরিচিত দুষ্কতীরাই পঞ্চায়েতের দখলদারি নিয়েছিল। শুনলে অবাক হতে হয়, এরা সবাই একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত। আচ্ছা, আপনি তো হুঙ্কার ছাড়লেন, এক্ষুণি যারা এই কাণ্ড করেছে, তাঁদের ধরে কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা দেবেন? ২৪ জনের নামে অভিযোগ উঠল। লোক দেখানো চারজনকে ধরা হলো আবার তাঁদের মধ্যে দুজনকে ছেড়েও দেওয়া হলো। ভাগ্যিস, ওখানে বিজেপি বা স্বয়ংসেবক পাওয়া যায়নি। আপনার পুলিশ ঠিক বেছে বেছে খুঁজে নিয়ে আসত। অবাক হতে হয়, আপনার দলের সমর্থক, অথচ আপনার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গায়েব হয়ে গেল। অবাক হতে হয়, আপনার দলের সমর্থক, অথচ আপনার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গায়েব হয়ে গেল। ছোট্ট তামান্না কী দোষ করেছিল? আপনার দলের মুখপাত্র, সাংবাদিক কুলশিরোমণি আবার এর পিছনে ষড়যন্ত্র খোঁজার চেষ্টা করেছেন। যে ভাবে আপনি বহিরাগত তত্ত্ব আমদানি করে, ঢিল ছুড়িয়েছিলেন, নেপথ্যে এনেছিলেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে। এমন দুর্ভাগ্য আপনার, সেই তত্ত্ব ধোপে টেকেনি। কেননা আপনিই প্ল্যান-এ বা প্ল্যান-বি, বা প্ল্যান সি-র উদ্ভাবক।

আপনার দলের বিধায়ক, এক সময়ের পুলিশ কর্তা, তিনি কোথায় গিয়ে দুষ্কৃতীদের কীভাবে ধরা যায়, সেই বিষয়ে পুলিশকে কিছু বুদ্ধি দেবেন, তা নয় তিনি পয়সা দিয়ে রফা করতে গেলেন? তামান্নার বাবার দোষ, তিনি অভাবী, পরিযায়ী শ্রমিক। তিনি কী দল করেন বিচার্য নয়। আপনার শাসনে রাজ্যে বোমা তৈরি একটা শিল্পের পর্যায়ে চলে গেছে, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবসা বা কারখানা কুটির শিল্পের বা লাভজনক ট্রেডিং বিজনেসের। আপনি একবার হুঙ্কার ছেড়েছিলেন, সব অস্ত্র উদ্ধার করবেন বলে। কী হলো? আসলে আপনি হয়তো পরিসংখ্যান জোগাড় করার চেষ্টা করেছিলেন, আপনার পোষা বাহুবলীদের কাছে কত অস্ত্র মজুত আছে? হয়তো আপনি প্রকারান্তরে যাদের কাছে অস্ত্র মজুত আছে, সেই অস্ত্র যাতে লুকিয়ে ফেলতে পারে, সেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন!

তামান্নার মৃত্যুর পর আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে আবার হুংকার ছাড়লেন, কাউকে ছেড়ে কথা বলবেন না। সবাই তখনই বুঝে গিয়েছিল, আসল অপরাধীদের পুলিশ দেখেও দেখবে না। আরে বাবা, ভোটের বাজারে ওই সব ভাইয়েরাই তো আপনার সব অবলীলায় একের পর এক সকেট বোমা মারল, আপনার পুলিশ জানত না। এটা কি ঠিক? আপনার গোয়েন্দা সেল কী কিছুই জানত না? না কি আপনার পুলিশের টীপার নামক শ্রেণী গড়ে তোলেনি?

হুমায়ুন কবিরকে শোকজ করেছে আপনার দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি। সেই সোনার পাথরবাটির মতো। হাতে টাকা দিয়ে পাঠিয়ে, যখন ল্যাজে গোবরে অবস্থা, তখন সাধারণের চোখে ধুলো দেবার একটা চেষ্টা আপনি করবেন, এটা সবাই জানে। একটা চার লাইনের চিঠি উনি জমা দেবেন, সেখানে হয়তো তিনি বলবেন, তার প্রচেষ্টা ছিল অরাজনৈতিক। এরপর দলের তরফে বলা হবে, দলকে না জানিয়ে কিছু করা চলবে না। তিনিও বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে বলবেন, না না, আর করব না। সাত খুন মাপ। যেমন কেষ্টর কীর্তি মানুষ দেখেছে।

ভোট আসছে। আর আপনি নেমে পড়েছেন ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে। আপনি ভুলে যাবেন না, আপনার ভোটব্যাংকে কিন্তু বড়ো ফাটল ধরেছে। সেটা আপনার দলের ভিতরে থাকা বহু মিরজাফর আছেন। যারা টিকিট প্রত্যাশী। তাদের স্বরূপ অচিরেই আপনি জানতে পারবেন। তখন আর সামলাবার সময় পাবেন না। ওই মিথ ভেঙে যাবে। আপনার দলের আপনিই সব, আপনার বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট। আপনার গৃহ যুদ্ধ আসন্ন। অন্য কোনো দলের কথা চিন্তা না করে, আগে ভাবুন নিজের অন্দরের কথা। খুব লাফাচ্ছেন ১০০ দিনের কাজকে ফিরিয়ে এনেছেন বলে। কিন্তু এবার যে ওই টাকা, যিনি কাজ করবেন, তার অ্যাকাউন্টে সরাসরি ঢুকবে। কী হবে আপনার ভাইয়েদের।

বারে বারে বড়ো কাঁচা খেলে ফেলেন আপনি। এই মৃত্যু কেনার নোংরা রাজনীতি বড়ো ক্লিশে। কেউ বিষ মদ খেয়ে মারা গেলেও, মৃতের পরিবারকে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। কী যে করেন আপনি? কার টাকায় আপনি দানছত্র খুলেছেন? একদিকে ছোট্ট তামান্নার শোকে যখন মুহ্যমান গোটা রাজ্য। আপনি ব্যস্ত রথ আর জগন্নাথের রাজনীতিতে। সেখানেও কাঁচা খেলা। একটা গজা আর প্যাড়া, যেটা প্রসাদই নয়, সেই ভাতার মতো, সাধারণ মানুষের দুর্বল ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে, সস্তার রাজনীতি করতে নেমেছেন। ছোট্ট তামান্না তার ধর্মীয় পরিচয় কী, তা হয়তো সাধারণ মানুষ কোনো মতেই বুঝবেন না। সে একটি শিশু? বোমার আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া একটি বাবা মায়ের স্বপ্ন। সব বাবা-মায়ের কাছে সে একটি সন্তানের পরিচয়ে পরিচিত। সেই তামান্নার জন্য আপনার হৃদয় ব্যথিত হয় না? আপনার দলের বিধায়ক গিয়েছিলেন মৃত্যু কিনতে। এই রাজনীতি আর কতদিন চালাবেন আপনি?

সামাজিক ব্যাধি বিচ্ছেদ ও সম্পর্কের সমাপ্তি

মৌ চৌধুরী

সহিষ্ণুতা শব্দটি অনেকেই বোধহয় ভুলতেই বসেছে। ধৈর্য শব্দটাও ছেড়ে দেওয়া গেল। সহ্যশক্তিও সবার সমান হয় না। বাকি রইল মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভালোবাসা, ভালোলাগা। আর সেটাও যদি দীর্ঘস্থায়ী না হয় তবে প্রশ্ন উঠবে সম্পর্কের বন্ধন আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? সামাজিক-পারিবারিক বন্ধন যদি ঘুচে যায় তবে সুষ্ঠু জীবন তো নষ্ট হয়ে যাবে। ভাবতে হবে তখন আমরা দাঁড়াব কোথায়। বিভিন্ন কারণে বর্তমান সময়ে 'পরিবার' শব্দটি মা-বাবা আর একটি সন্তানের ভেতরেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আধুনিক ভাষায় নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি।

সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে এই তথাকথিত নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির বেশিরভাগ সন্তান হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, ভোগবিলাসী, কেরিয়ার সর্বস্ব। এর অন্যতম কারণ প্রথম থেকেই তারা দেখে ও শিখে এসেছে, তাদের বাবা-মা তাদের একটা নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। যেখানে সর্বক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নেই।

এই অকারণ প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেওয়ার ফলে ছোটো থেকেই তারা এক প্রকার স্বার্থপরতা শিখে যায়। ফলে ভারতীয় আদর্শের মূল্যবোধ কখনো গড়ে ওঠে না তাদের মনে। ফলে পরিজন ও সমাজের প্রতি মমত্ববোধ, ভালোবাসা ব্যাপারটা তাদের মধ্যে তৈরি হয় না। পরবর্তী সময়ে তাদের অনেকেই হয়তো 'প্রতিষ্ঠিত' হয়ে যায়। আর তখনই গড়ে ওঠে অবাধ মেলামেশা। অতি দ্রুত সম্পর্ক গড়ে ওঠা এবং বিবেচনাহীন হয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা। দেখা গিয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিছুদিনের মধ্যেই সে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। প্রাক বিবাহিত জীবনের সম্পর্ক যদি বছর দুয়েকও টিকে যায়। বিবাহিত জীবন ছয় মাসও থাকে কিনা সন্দেহ।

সামাজিক সম্প্রীতির শিক্ষার অভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার ভেতর কোনো সময় নেই। যেকোনো সময়ে যেকোনো পরিস্থিতিতে সম্পর্কের টানাপোড়েন এলেই বিন্দুমাত্র ভাবনা না করেই বলে দেওয়া হয় 'ব্রেক আপ'। একটা সম্পর্ক ভাঙতে এক মুহূর্ত সময় বা ভাবনার প্রয়োজন হয় না। কথায় কথায় সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে আসার এই পাশ্চাত্য কালচার আমাদের সমাজে এখন নয়া ফ্যাশন।

বর্তমান সময়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে যারা জড়িয়ে আছেন তাদেরও অনেকেরই বিভিন্ন কারণে একটা সময়ে একে অপরকে আর ভালো লাগে না। শুরু হয়ে যায় ইগোর লড়াই। কিংবা উভয় তরফে চলতে থাকে দোষারোপের পালা। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আদালতে ডিভোর্সের ফাইল জমা পড়ছে। কেউ হয়তো এর মধ্যেই আবার নতুন সঙ্গী জোগাড় করে নিয়েছে। পাশাপাশি চলতে থাকে পরকীয়া সম্পর্ক। লিভ ইন বা সমলিঙ্গের সম্পর্ক সমাজের চোখে নিন্দনীয় হলেও আইনগত খুব একটা বাধা নেই। তার উপর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকলে সমাজ, আদর্শ পরম্পরা এসবের কে তোয়াক্কা করে, গুরুত্ব দেয়? তখন স্বামী স্ত্রীর ভেতর শুরু হয় এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা, কে কাকে কতটা অসম্মান করবে, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বে, এর জেরে যদি সন্তান চলে আসে তবে প্রকাশ্যে জানিয়ে গর্ভপাত করতেও দ্বিধা করে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে তো ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে যেতে দেখা যায়। এর প্রতিফলন পরিবার ও সমাজের ওপর এসে পড়ে।

প্রায় প্রতিনিয়ত এই ধরনের বিপর্যয়ের ঘটনাগুলো চোখের সামনে আসছে। সমাজ বিজ্ঞানী স্নেহলতা দত্ত মনে করেন সমাজ মাধ্যম ও সংবাদপত্রের তকমা দেওয়া তথাকথিত জেনারেশন এক্স, ওয়াই, জেডের ব্রেকআপ ও ডিভোর্স এখন দৈনন্দিন জীবনে একটা চলতি অধ্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে সমাজ একটু একটু করে শান্তি আর সামাজিক শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলছে। এই জেনারেশনের অনেকের কাছে শান্তি মানে আদালতে মিউচুয়াল ডিভোর্স। এটাই এখন অনেক সহজ হয়ে এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে মানসিক ডিপ্রেশনে চলে গিয়ে নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে। অধ্যাপিকা স্নেহলতা মনে করেন অভিভাবকদের আরও সহিষ্ণু হয়ে এই নতুন প্রজন্মকে আরও সংযত হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। চাইলেই হাতের কাছে সব দিয়ে দেওয়া নয়। বিচ্ছেদ মানেই জীবন নয়, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানের বিবাহের পর বাবা-মায়েরা কখনোই তাদের ইন্ধন জোগাবেন না বিচ্ছেদের জন্য, বরং তাদের বন্ধন যেন দৃঢ় হয় সেই চেষ্টাই করা উচিত।

ভারতে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের শিক্ষা হলো মানুষকে ছোটো থেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসংযম শেখানো দরকার। স্বেচ্ছাচারিতা কখনোই নয়। সন্তানকে ছোটো থেকে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ করতে পারলে ভালোবাসা জন্মাবেই। অসামাজিক এবং কু-সামাজিক ফ্যাশন ব্যাধি ব্রেক আপ, বিচ্ছেদ থেকে সমাজ মুক্ত হতে পারবে। ভবিষ্যতে সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে। □

পার্কিনসনস

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

দিনে দিনে হাঁটার গতি কমছে ঠাকুমার। নীতু রোজ লক্ষ্য করে। আগে সইটা খুব সুন্দর করত ঠাকুমা। এখন সই করতে গেলে বেশ কয়েকবার প্র্যাকটিস করিয়ে নিতে হয়। আনন্দ নেই ঠাকুমার মনে, একটা ডিপ্রেশন সারাক্ষণ। ইদানীং ঠিকমতো খেতে চাইছে না। হাতটা খুব কাঁপে। জামাকাপড় ছাড়তে একেবারে ল্যাজেগোবরে। এই সবই নাকি পার্কিনসনস-এর লক্ষণ। নীতু জানতে চেয়েছিল রোগটা সম্পর্কে। ডাক্তার বলেছেন এই রোগে আক্রান্তেরা ক্রমেই স্বাভাবিক কাজ করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেন। পোশাক পরিবর্তন থেকে বাথরুম যাওয়া— সব কিছুর জন্যই অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে থাকেন দিনে দিনে। এমনই জটিল স্নায়ুর অসুখ।

পার্কিনসনস ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে বিশ্বে এক কোটির বেশি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। ১৮১৭ সালে চিকিৎসক জেমস পার্কিনসন চিহ্নিত করেন রোগটিকে। দু'দশক আগেও এই রোগ সম্পর্কে মানুষের তেমন ধারণা ছিল না। এখন দিনে দিনে বাড়ছে এই অসুখ। প্রতিবছর ১১ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে পালিত 'বিশ্ব পারকিনসনস দিবস'। এই দিনটি পালনের উদ্দেশ্য পার্কিনসনস রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং আক্রান্তদের পরিবারকে সঠিক পথের দিশা দেখানো।

কারা বেশি আক্রান্ত

বেশি বয়সের রোগ পার্কিনসনস। মহিলাদের হয় তবে পুরুষদের সংখাই অনেক বেশি। মূলত বয়স্কদের রোগ হলেও আক্রান্ত হতে পারেন কমবয়সিরাও। চিকিৎসার পরিভাষায় একে বলা হয় 'ইয়ং অনসেট পার্কিনসনস ডিজিজ' (ওয়াইওপিডি)। সমীক্ষা বলছে, বিশ্ব পার্কিনসনস রোগে আক্রান্তদের দুই শতাংশ এই ওয়াইওপিডির শিকার। কারও পরিবারে মা অথবা বাবা যদি পার্কিনসনসের শিকার হন, তা হলে তাঁদের সন্তানদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ৩০ শতাংশ।

উপসর্গ

- ঘন ঘন পেশি শিথিল হয়ে পড়ে।
- বিশ্রামে থাকাকালীন পেশির কম্পন হয়।
- পেশি শক্ত হয়ে যায়, স্টিফনেস। নড়াচড়া করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- হাঁটাচলার সমস্যা হয়। হাঁটার সময় ভারসাম্য বজায় রাখতে অসুবিধা, নড়াচড়ায় গতি কমে যায়, একে বলে ব্র্যাডিকাইনেসিয়া।
- ফেসিয়াল মাস্কিং অর্থাৎ মুখমণ্ডলে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি কমে যায় ফলে মুখ নিষ্প্রাণ দেখায়।
- বারবার পড়ে গেলে বুঝতে হবে সমস্যা হচ্ছে।
- ঘুমের সমস্যা। রাতে ঘুমাতে অসুবিধা এবং দিনের বেলা অতিরিক্ত ঘুম ঘুম ভাব।
- হতাশা এবং উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এবং মেজাজ পরিবর্তনের প্রবণতা।
- স্মৃতিশক্তির সমস্যা, কিছু ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া বা চিন্তাভাবনায় সমস্যা।
- কোষ্ঠকাঠিন্য, হজমে সমস্যা হতে পারে।
- গন্ধের অনুভূতি হ্রাস, কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ঘ্রাণশক্তি কমে যেতে পারে।
- ক্লান্তি, অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করা।
- অস্থির পা, রাতে পায়ে অস্থিরতা বা ব্যথার অনুভূতি।

চিকিৎসা

পার্কিনসনস-এর জন্য কিছু নির্দিষ্ট ওষুধ রয়েছে। পার্কিনসনস সম্পূর্ণ সারে না তবে মেডিকেশনের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। চিকিৎসকেরা প্রথমে সেই চেষ্টাই করেন। দীর্ঘদিন ওষুধ খেয়ে যেতে হয়। তবে সেই ওষুধ কাজ না দিলে এরপর কিছু থেরাপি রয়েছে পার্কিনসনস-এর চিকিৎসায়, যার মধ্যে অন্যতম হলো 'ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন থেরাপি'। এই চিকিৎসায় এখনও পর্যন্ত ভালোই সাড়া পাওয়া গেছে। যদিও তা খরচাসাপেক্ষ।

কেন হয়

চিকিৎসকদের মতে, দিনে দিনে পার্কিনসনস বেড়ে চলার অন্যতম কারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান গড় আয়ু। এছাড়া রয়েছে অন্য কারণ যেমন, চাষে কীটনাশকের ব্যবহার, প্লাস্টিক-দূষণ, বায়ুদূষণ, জলদূষণ এবং কমসংখ্যক হলেও জেনেটিক মিউটেশন। কম বয়সিদের মধ্যেও এই রোগ দেখা যাচ্ছে, যার কারণ জেনেটিক মিউটেশন। ডোপামিন নামক একটি রাসায়নিক আমাদের মন-মেজাজের উপর প্রভাব ফেলে। মস্তিষ্কের যে অংশ থেকে ডোপামিন নিঃসৃত হয়, তা অকেজো হলে পার্কিনসনস হতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, পার্কিনসনস-এর উৎস হলো পেট। ইজরায়েলের একদল স্নায়ু চিকিৎসক দেখিয়েছেন পেটেই প্রথম হানা দেয় পার্কিনসনস। সেখানেই দীর্ঘসময় ঘাপটি মেরে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বিশেষ একরকম প্রোটিনে ভর করে স্নায়ু বেয়ে বেয়ে লাফিয়ে ওঠে মস্তিষ্কে। পেটের গোলমাল, হজমের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস, অম্বল থেকে শুরু হয়। অন্ত্রের ক্ষতি যদি বেশি মাত্রায় হয়, তা হলে সেখানকার স্নায়ুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্নায়ু মারফত সংকেত মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারে না। মানসিক সমস্যা দেখা দিতে থাকে। সেখান থেকেই মস্তিষ্কে প্রভাব খাটাতে শুরু করে পার্কিনসনস। কাজেই সুস্থ খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, প্রাণায়াম সবার জন্যই খুব জরুরি। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা রোগীকে স্থিতিশীল রাখা সম্ভব। □

বালুচিস্তানের স্বাধীনতার যুদ্ধ মানবিকতার লড়াই

সুজিত রায়

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বালুচিস্তান। একাধিক সশস্ত্র বালুচ সংগঠন সম্মিলিতভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে দফায় দফায় উড়িয়ে দিয়ে বালুচিস্তানের দিকে দিকে উড়িয়েছে নতুন স্বাধীন বালুচিস্তানের পতাকা। গোটা রাজ্য জুড়ে এখন একটাই স্লোগান— Stronger nation United people। বালুচের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভারতের কাছ থেকে স্বীকৃতি চেয়ে অনুরোধ পাঠিয়েছে। দাবিসনদ পাঠানো হয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছেও। পরিস্থিতি ইশারা দিচ্ছে, পাকিস্তান আবার টুকরো হবে অবিলম্বে। ১৯৭১-এ পূর্ব-পাকিস্তান বেরিয়ে এসেছিল পাকিস্তানকে দু'টুকরো করে দিয়ে। এবার বেরিয়ে আসতে চলেছে বালুচিস্তান। হয়তো এরপর পালা পাকতুনিস্তানের যে রাজ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে পাক-সংস্কৃতির বৈরিতা বহুকালের। হয়তো এবার কালনেমি ভাগের মতো পড়ে থাকবে একটুকরো পাকিস্তান, যার এখন আন্তর্জাতিক পরিচয় হলো জঙ্গিস্তান।

অতীতে স্বাধীন শাসকদের অধীনস্ত বালুচিস্তান ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেই প্রকৃত বালুচে ইসলাম মজহবের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সর্বাধিক প্রাধান্য ছিল হিন্দুধর্মের। সেই সঙ্গে বৌদ্ধমত ও জোরাথেট্রিয়ানদের অবস্থিতি। সপ্তদশ শতকে আরবের সামরিক হানার পর বালুচিস্তানে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। ধর্মান্তকরণের শিকার হন অধিকাংশ মানুষ, যদিও তা নিয়ে অশান্তি ও রক্তপাত সেভাবে ঘটেনি। কিন্তু যেসব হিন্দুরা হিন্দু হয়েই থাকতে চেয়েছিলেন— তাঁদের ধারাবাহিকতা আজও বজায় আছে, যদিও সংখ্যায় তাঁরা সীমিত। সীমিত হওয়ার সবচেয়ে বড়ো কারণ পাকিস্তানি অত্যাচার। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার পরপরই ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গায়ের জোরে বালুচিস্তান দখল করে এবং ইসলাম ধর্মান্তকরণকে সরকারি নীতির অঙ্গীভূত করে হিন্দুদের জবরদস্তি মুসলমান হতে বাধ্য করে। ফলত একদা অমুসলমান বালুচিস্তানে আজ হিন্দু জনসংখ্যা হাতে গোনা ৫৯,১০৭। যদিও পাকিস্তান দাবি করে— ওই সংখ্যাটা নাকি ১ লক্ষ ১৭ হাজারেরও বেশি। এটা প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেটা প্রচার নয়, সেটা বালুচের মোট জনসংখ্যা ১৪ লক্ষ ৮৯৪ হাজার ৪০২ জনের মধ্যেই ০.৪১ শতাংশ হিন্দু জনগণের হৃদ্যতার সম্পর্ক আজীবনের। বালুচের মুসলমান মানে ইসলাম সর্বস্বতা নয়। মানবিকতা আর উন্নয়নই হলো বালুচবাসী 'প্রথম এবং প্রথম' দাবি।

বালুচিস্তানের এক পাশে প্রতিবেশী আফগানিস্তান। সেখানে তালিবানি অত্যাচার। আর এক দিকে পাকিস্তান— বিশ্বের দ্বিতীয় বিভীষিকাময় সন্ত্রাসী দেশ যেখানে সরকার চালায় বকলমে নৃশংস জঙ্গিরাই। তবুও সমস্ত সন্ত্রাসের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বালুচিস্তান এখনও মানবিক। পাকিস্তানের কাছে 'হারেম সন্তান'-এর মতো অসম্মানে পদদলিত এবং তীব্র অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যের শিকার হয়েও এখনও মানুষ মানুষের হাত ধরে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। গড়ে তুলতে চায় বিশ্বের বুকে এক টুকরো ভারতবর্ষ। কারণ বালুচবাসী বিশ্বাস করে আর দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখে ব্যানার--- Baluch and Indian friendship is the only weapon that will dent, damage and destroy the DEVIL--- PAKISTAN.

বালুচিস্তানে স্বাধীনতার দাবিসনদ এত জোরদার কেন? বালুচিস্তানের মানুষ শান্তিপ্রিয় কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড বিক্রয়যোগ্য নয়। ফলত বৈদেশিক আক্রমণের মুখেও বালুচিস্তানের আঞ্চলিক রাজারা কখনো মাথা নীচু করেননি। তার উজ্জ্বল প্রমাণ রাজা দাহির সেন। ১৯৫৮ সালে তিনি কালাত অঞ্চল (রাজ)-কে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন। যদিও ওই বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবে One Nation one Movement one Country Balochistan—

এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বালুচিস্তানে প্রথম বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় ১৯৪৮ সালে যখন মির আহমেদ খান কালাতের সঙ্গে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে তাঁর ভাই প্রিন্স আগ। আবদুল করিম বালুচ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহের সুরে বাঁধা ছিল বালুচিস্তানের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন। কারণ ভারতবর্ষকে টুকরো করে পাকিস্তান গঠনের যে নজির মুসলিম লিগ রেখেছিল, তাতে বালুচিস্তানের মানুষ শঙ্কিত ছিল যে অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানি শাসনে বালুচের ভালো কিছু হবে না।

প্রকৃতপক্ষে হলোও তাই। বালুচিস্তানকে নিঙড়ে নিয়ে লাহোর আর করাচীর শিখ ও মুসলমান সম্প্রদায় ধনসম্পদের পাহাড় গড়লো, আর বালুচিস্তানের ভূমিপুত্ররা অনাহারে, অনিদ্রায়, অশিক্ষায়, রোগে ভুগে কঙ্কালসার হয়ে বেঁচে রইল একটাই আশা নিয়ে— পাকিস্তানকে তাড়িয়ে বালোচ জনগণ একদিন স্বাধীন হবে। সেদিন তারা দুবেলার খাবার পাবে। রাতে শান্তির ঘুম পাবে। হাতে হাতে কাজ পাবে। সন্তানরা শিক্ষিত হবে।

ঠিক এই মুহূর্তে বালুচিস্তানের মানুষের এই স্বপ্ন অবাস্তব মোহনীয় কিছু নয়। কারণ বালুচিস্তান হলো প্রাকৃতিক সম্পদের খনি। এখানকার পাহাড়ি ভূস্তরে প্রকৃতি সাজিয়ে রেখেছে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, তামা, আকরিক লোহা, ক্রোমাইট, মার্বেল, সালফার, ভূগর্ভস্থ তেল, লাইম স্টোন বা চুনা পাথর-সহ নানা সামগ্রীর ভাণ্ডার। অফুরন্ত তার সঞ্চিত সম্পদ। সেই সম্পদকে ব্যবহার করে বালুচিস্তানের সামগ্রিক উন্নয়ন একটি অতি বাস্তব চিন্তাধারা। কিন্তু পাকিস্তান শুধু লুটে নিয়ে যায়। বালুচের সম্পদ বিকিয়ে যায় লাহোরে, পঞ্জাবে, করাচীতে, রাওয়ালপিণ্ডিতে। আর বালুচিস্তানে মাথাপিছু আয় হুহু করে নামতে নামতে এসে দাঁড়ায় ১৮২৪ মার্কিন ডলারে— পাকিস্তানের জাতীয় মাথাপিছু আয়ের চেয়ে ৩৮ শতাংশ কম। দারিদ্রের স্তর বাড়তেই থাকে এবং দারিদ্র্যের পরিমাণ পৌঁছে যায় ৭১.২ শতাংশে। ফলত বালুচিস্তানে শিক্ষার হার মাত্র ২৫ শতাংশ। জিডিপি রেট মাত্র ৫.৩৩ শতাংশ। মানবিক উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) নেমে আসে ০.৪২১-এ। তাই জনসংখ্যার প্রতি তিনজনের একজন বেকার।

আয়তনে ৩,৪৭,১৯০ বর্গ কিলোমিটার বালুচিস্তান পাকিস্তানের মোট আয়তনের ৪৩ শতাংশ জুড়েই রয়েছে। অথচ নিজের ভূগর্ভের সম্পদ ব্যবহারের অধিকার বালুচ সরকারের নেই। প্রায় এক কোটি জনগণকে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু কায়িক শ্রমই করে যেতে হয়। আর্থিক উন্নতি, শিক্ষার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন সবই থেকে যায় স্বপ্ন হয়ে। এখানে মেয়েদের পড়াশোনার ওপর জোর দেয় না পাকিস্তান। ছেলেদের ভর্তি করে মাদ্রাসায় যার ফলে আন্তর্জাতিক স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে না দুর্ভাগা সন্তানেরা। যে মাটিতে এত খনিজ সম্পদ সেখানে গত ৭৫ বছরে কলকারখানায় ডুবে যেতে পারতো। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না, ভূসম্পদ উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় পাকিস্তানের শিল্পপতিরা সরাসরি সরকারি মদতে ও নির্দেশে। স্থানীয় মানুষের চোখের সামনে লুট হয়ে যায় সব। বালুচকে বলা হয় প্রাচ্যের ফ্রুট বাস্কেট। এখানকার মাটিতে অসাধারণ চাষ হয় পেয়ারার, চেরি ফলের, কাঠবাদামের, পিচফলের আর বেদানার। কিন্তু চাষির হাতে টাকা আসে সামান্যই। মধ্যস্বত্বভোগীরা সব উঠিয়ে নিয়ে যায় করাচী, লাহোর, পঞ্জাব, রাওয়ালপিণ্ডির বাজারে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এতটাই খারাপ যে উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে ভুগতে থাকে হাসপাতালগুলিতে আসন্নপ্রসবা মা এবং সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুমৃত্যুর হার আকাশছোঁয়া।

রাজ্যের ১/৩ অংশে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার কোনো সুযোগ না থাকলেও, পরমাণু গবেষণার প্রাপ্ত বোমার বিস্ফোরণগুলি ঘটানো হয় বালুচিস্তানের মাটিতেই। ফলত সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শিশুরা প্রতিনিয়ত পরমাণু বিকিরণের শিকার হচ্ছে। প্রকৃতি শেষ হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক মানসিকতা নিয়ে পাকিস্তানের অত্যাচারে বালুচিস্তান রুক্ষ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাক সরকারের কোনো আগ্রহ নেই। গোটা রাজ্য জুড়ে পানীয় জলের অভাব দূরীকরণে কোনো প্রকল্প নেই, পর্যটন শিল্পকে উন্নত করার কোনো প্রচেষ্টা নেই। আগ্রহ শুধু গুচ্ছের খারিজি মাদ্রাসা খুলে বালুচের নিরীহ শিশুদের ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা আর তরুণ প্রজন্মকে সন্ত্রাসী শিক্ষায় চোস্ত করে তোলা, যাতে দেশে বিদেশের সন্ত্রাসবাদী হামলায় বালুচ যুবক যুবতীরা অংশ নিতে পারে।

ইতিমধ্যে বালুচিস্তানের ওপর চীনের নজর পড়েছে পাকিস্তানের সাহচর্যে। তারা আরব সাগরের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে পশ্চিম চীনের সঙ্গে বালুচিস্তানের গোয়াদর বন্দরকে যুক্ত করতে একটি দীর্ঘ সড়কপথ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। বালুচ এর বিরোধিতা করেছে। ফলে চীনের দখলদারি মনোভাব কিছুটা হলেও থমকে দাঁড়িয়েছে। ২০২৪ সালে বালুচিস্তানের সংগ্রামী কোনো একটি সংগঠনের অতর্কিত হামলায় ৬২ জন চীনা শ্রমিকের মৃত্যুও হয়েছিল।

এই মুহূর্তে বালুচিস্তানে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় বালুচ লিবারেশন আর্মি, বালুচ লিবারেশন ফ্রন্ট, বালুচ রিপাবলিকান গার্ডস এবং সিন্ধুদেশ রেপোজিনারি আর্মি। ২০২২ সালের ২১ মার্চ পরাধীন বালুচিস্তানের স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়েছে হিন্দ-বালুচ ফোরামের নেত্রী নায়েলা কোয়াড্রি বালুচের নেতৃত্বে কানাডার অভ্যন্তরে। তিনি চান বালুচের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি ভারত সাহায্য করুক, যেমন বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা নিয়েছিল ভারত সরকার। প্রয়োজনে বালুচ ভারতের অঙ্গীভূত হতেও রাজি বলে হিন্দ বালুচ ফোরামের তরফে বলা হয়েছে।

বর্তমান বালুচিস্তানের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দলগুলিও চায়, ভারত সরাসরি সাহায্য করুক বালুচকে। নায়েলা ইতিমধ্যেই জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের সাহায্য চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'সংগ্রামী ভারতের সঙ্গে বালুচের সব মতপথের মানুষের আত্মিক সম্পর্ক আছে। আমরা হাজার বছর ধরে একসঙ্গে আছি। পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত মানুষ তো বালুচিস্তানকে চেনেই না।

জানলে মানুষ বালুচিস্তানকে পূজা করত।'

বালুচ বিদ্রোহের অন্যতম চরম আক্রমণ ছিল জাফর এক্সপ্রেস অপহরণ। চলতি বছরের ১১ মার্চ বালুচ লিবারেশন আর্মির নেতৃত্বে বোলান জেলায় এই ট্রেন অপহরণের ঘটনাটি ঘটেছিল। চারশো যাত্রীবাহী ৯টি বগির এই ট্রেনটি যাচ্ছিল কোয়েটা থেকে পেশোয়ার। পথে বোলান জেলায় এক নির্জন ও জনশূন্য এলাকায় বালুচ লিবারেশন আর্মির সশস্ত্র যোদ্ধারা বন্দুকের মুখে ট্রেনের দখল নেয়। রেললাইনে বোমা মেরে ট্রেন থামাতে বাধ্য করা হয়। গোটা ঘটনায় নিরাপত্তা কর্মী-সহ ১০ জনের মৃত্যু হয় এবং রেলের চালক গুরুতর আহত হয়।

লিবারেশন আর্মির দাবি ছিল বালুচিস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পালটা প্রত্যাঘাতে বিএলএ-রও ৩৩ জনের প্রাণহানি হয়। এছাড়াও বালুচ লিবারেশন আর্মি বালুচিস্তানের ৫১টি অঞ্চলে ৭১ জায়গায় মূলত পাকসেনাকে লক্ষ্য করে বিধ্বংসী আক্রমণ হানে।

এমনকী সম্প্রতি পাক-ভারত যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলে একটি সেনাবোঝাই সামরিক ট্রাককে মাইন দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। বিএলএ-র নেতা এবং বালুচ সাহিত্য জগতের এক নক্ষত্র মির ইয়ার বালুচ বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন, বালুচিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। নতুন পতাকা তৈরি হয়েছে। নতুন জাতীয় সংগীত রচনা করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন স্বাধীন বালুচের নতুন মুদ্রা ছাপার এবং নতুন পাসপোর্ট তৈরির আইনি অধিকার। আর দরকার বিশ্ববাসীর সমর্থন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের আর্থিক সাহায্য। বালুচিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধে বালুচ মহিলারাও সোৎসাহে অংশ নিয়েছেন। মহিলা নেত্রী হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন বালুচ ইয়াকজেহতি কমিটির প্রধান ও মানবাধিকার কর্মী মাহরাং বালুচ যাঁকে 'বালুচিস্তানের সিংহী' নামে অভিধা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আছেন লায়লা কাদারি বালুচ, বিবি গুল বালুচ, সুমাইয়া কালান্দ্রানি বালুচ, বানিক মাহিকান বালুচ প্রমুখ।

বালুচিস্তানের বালুচ সম্প্রদায় যুদ্ধবাজ নয়। কিন্তু জাতীয়তার লড়াইয়ে এরা আপোশহীন। ১৯৪৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বারে বারে পাক সরকারের বিরুদ্ধে এরা বিদ্রোহ করেছেন। পাক সেনার আক্রমণে এঁদের প্রাণ গেছে। কিন্তু ফিনিক্স পাখির মতো বালুচরা আবার আকাশে বিদ্রোহের ডানা মেলেছে মানবাধিকারের স্বার্থে। দেশে বিদেশে বালুচদের বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে তকমা আঁটার চেষ্টা হলেও তা বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। বিশ্বের ১৬৯তম দেশ হিসেবে বালুচিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর জাতীয়তাবাদীর সংগঠনগুলি চেষ্টা করছে একটি সম্মিলিত প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে একত্রিত হয়ে মানুষের সাম্যের গান গেয়ে স্বাধীনতাকে সফলভাবে উদ্‌যাপন করার। আগরতলার বাঙ্গালি কবি পলাশ কুমার রায় তাঁর বালুচ শীর্ষক কবিতায় তুলে ধরেছেন সেই উদ্বেল স্বাধীনতার যুদ্ধের কথা—

আজ বালুচদের মুখে মুখে ঘোরে
বাঙ্গালির বীর গাথা।
আজ বালুচদের হৃদয়ের কথা
স্বাধীনতা স্বাধীনতা।

হায় রে সময়
হায় ইতিহাস
নিষ্ঠুর তোরা কত
ভবিষ্যতে কি বালুচও হবে
বীর বাঙ্গালির মতো?

ইজরায়েল : বাঙ্গালি হিন্দুর অতীত ও ভবিষ্যৎ পাঠ

অরিন্দম ভট্টাচার্য্য

প্রায় ১৯০০ বছর ধরে যে জাতিটার নিজস্ব কোনো দেশ ছিল না, ১৯৪৮ সালে তারা পেয়েছিল একখণ্ড ভূমি। আজ সেই দেশের মাত্র দেড় কোটি মানুষ বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিষেবাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাঁদের মেধা, প্রযুক্তি, হার-না-মানা মনোবৃত্তি এবং প্রবল স্বাজাত্যবোধের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের জীবনকে তাঁরা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করছে। সেই জাতিটি ইহুদি এবং দেশটির নাম হলো—ইজরায়েল। ইহুদিদের হাত ধরেই বর্তমানে তৈরি হচ্ছে মহাকাশযান থেকে শুরু করে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। তাঁদের যোগদানেই অর্থনৈতিক সাফল্য লাভ করছে বিভিন্ন দেশ। তাঁরা তৈরি করেছে ক্ষত্রিয়তার নতুন সংজ্ঞা।

ভারতীয় সমাজে বৈদিক মতে বর্ণাশ্রম হলো গুণ ও কর্মাশ্রিত। তার ছায়া যেন দেখা যায় ইহুদি জাতির মধ্যে। তাঁদের একদল নিজেদের উপাসনা পদ্ধতি, নিজেদের জাতির ইতিহাস জেনে, পড়াশোনা ও মেধার দ্বারা সুরক্ষিত করছে তাঁদের ভবিষ্যৎ। তাঁদের বিজ্ঞানীরা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে তৈরি করছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, এর ফলে বহু মানুষের কর্মসংস্থান ও উপার্জনের পথ হচ্ছে উন্মুক্ত। তাঁরা আক্রান্ত হলে তাঁদের সেনা ও প্রযুক্তির বলে বলীয়ান ক্ষত্রিয় সমাজ প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ১৫০০ বছরের আদিম-বর্বর ব্যবস্থার অনুসারী জেহাদিদের। তাঁদের বৈশ্য সমাজ বিনিয়োগ করছে দেশে-বিদেশে। নেতৃত্ব দিচ্ছে ব্যাংকিং, আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যে। বিশ্বের ৮০ শতাংশ ব্লু-চিপ কোম্পানির মালিক তাঁরা। বড়ো মাপের ন্যানোটেকনোলজি, অ্যাগ্রোটেক, ফার্মা, অস্ত্রশস্ত্র (আর্মস্), সিমুলেশন, এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা), খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাসায়নিক শিল্প, চামড়া, পোশাক, প্রসাধনী শিল্পের মালিক ইহুদিরা। প্রায় ৭২ শতাংশ প্রযুক্তির পেটেন্ট ইহুদিদের হাতে রয়েছে। বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ও কর্মরত ইহুদিরা অর্থপ্রেরণ করে থাকে ইজরায়েলে। কোটি কোটি ডলার, পাউন্ড, ইউরো, দিনার দিয়ে তাঁরা সমৃদ্ধ করছে ইজরায়েলের অর্থভাণ্ডার। তাঁদের দেশের কৃষক, শ্রমিক, জনগণের কাছে তাঁদের দেশ এক পবিত্র ভূমি, একখণ্ড 'প্রমিসড্ ল্যান্ড'। এরা পুঁজি, অর্থ, ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পের মর্ম বোঝে। জন্মের পর থেকে তাঁরা জানে যে, জেহাদিরা তাঁদের শত্রু। জেহাদি শক্তির পিছনে কমিউনিস্ট এবং উওক কালচারপন্থীদের মদত সম্পর্কেও তাঁরা অবহিত। কয়েক দশক আগে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ৮টি ইসলামি দেশের বিরুদ্ধে ৮টি ফ্রন্টে তাঁদের যুদ্ধ লড়তে হয়েছে। সেই শত্রুদের তারা হারিয়েছে বার বার। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ইওরোপে তাঁদের প্রভাব সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন উন্নত দেশের শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি, অর্থনীতি ইহুদিদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এটাই তাঁদের অ্যাডভান্টেজ। ভাতা, ভাঁওতা, ভিক্ষার জাতি হিসেবে তারা তৈরি হয়নি কোনোদিন।

পৃথিবীতে অনেক উন্নত দেশ রয়েছে। বেলজিয়াম, সুইডেন, নরওয়ে, কানাডা, ব্রুনেই, সৌদি আরব, কাতার, সিঙ্গাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি ছোটো ছোটো অনেক দেশ নানা ক্ষেত্রে বর্তমানে উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে গিয়েছে। আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, চীন—এই দেশগুলি বিশ্বের বড়ো অর্থনীতি। অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে ধনী বা সম্পদশালী হলেই জাত্যাভিমান বা জাতিসত্তাবোধ তৈরি হয় না। জাতিসত্তাবোধ একটি দেশকে প্রদান করে জাতীয় সুরক্ষা। বিভিন্ন দেশে যাওয়া, থাকা, ঘুরে দেখার সুবাদে দেশগুলি সম্পর্কে জানার কিছুটা সৌভাগ্য হয়েছে এই প্রতিবেদকের। সেই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি তুলে ধরার জন্যই এই লেখার অবতারণা।

সিঙ্গাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন দেশ। ব্যবসা বাণিজ্যেও উন্নত। এই দেশগুলির মানুষ সৎ, দেশগুলিতে দুর্নীতি কম। কিন্তু দেশগুলি প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভর নয়, পরনির্ভর। আমেরিকা, ইওরোপের রয়েছে হাজার হাজার বহুজাতিক কোম্পানি। দেশগুলিতে রয়েছে প্রচুর নৌবন্দর ও বিমানবন্দর। লক্ষ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতির এই দেশগুলিতে জনজীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। কিন্তু চীন হাইপারসনিক মিসাইল বা উত্তর কোরিয়া হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা করলে পশ্চিমি শক্তি কেমন যেন একচু স্তিমিত হয়ে যায়। দেশগুলি হলো ক্ষাত্রবীর্যবর্জিত। আমেরিকার মোসাহেব ও তল্পিবাহক হয়ে দেশগুলির কী লাভ? এগুলি প্রকৃতপক্ষে কোনো বলিষ্ঠ দেশ বা জাতি নয়। এই অবস্থা বর্তমানে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের ক্ষেত্রেও। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স-সমন্বিত ন্যাটোর সাহায্য না পেলে রাশিয়ার আঘাতে ইওরোপের অনেক দেশই ধ্বংস হতে পারে। এগুলি উন্নত জাতি হলেও

ক্লীবতায় জর্জরিত।

১৯৪৭-এর স্বাধীনতার পর বহু দশক ধরে ভারতও ছিল অনুন্নত, পরনির্ভর একটি দেশ। ১৯৯১-এর পর আর্থিক সংস্কার কর্মসূচি রূপায়িত হতে থাকলে ধীরে ধীরে ভারত একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়। বিগত ৫০০০ বছরের ইতিহাসে ভারত ছিল একটি সুপ্রাচীন সভ্যতা। ভারত ছিল উন্নত, পরম বৈভবশালী একটি দেশ। বিশ্বের জিডিপি-র সিংহভাগ অবদান ছিল ভারতের। বর্তমান বিশ্বের বিরাট অঞ্চল অধিকার করে রয়েছে আমেরিকা, রাশিয়া ও চীন। তাদের নিজস্ব অর্থনীতি, পণ্য উৎপাদন, ব্যবসা, আমদানি-রপ্তানি, সেনাবাহিনী, অস্ত্রব্যবসা, অন্য দেশগুলিকে পণ্য সরবরাহ এবং তার সঙ্গে সেই দেশগুলিকে সুরক্ষা প্রদানের গ্যারান্টি হলো বিগত ৭৫-৮০ বছরের বিশ্বের চলমান ইতিবৃত্ত। এদের পদতলে হাজির থাকে বাকি পৃথিবী, বেঁচে থাকার জন্য। অহিংসা ও অবনতি দুর্বলতা ও ক্লীবতার পরিচায়ক। উন্নত দেশগুলিই তাই বিশ্ব শাসনের যোগ্য। উৎপাদনে স্বনির্ভর দেশগুলির অর্থনীতিও স্বাভাবিক নিয়মেই রপ্তানি-নির্ভর। তাদের দেশে চলে একমাত্র তাদের নিজস্ব আইন। বিশ্বজুড়ে অস্ত্র উৎপাদন এদের নিয়ন্ত্রণে। দেশের উপর সংকটের মেঘ ঘনিয়ে উঠলে, বা দেশের উপর এতটুকু আঘাত এলে তারা প্রতি-আক্রমণে পিছপা হয় না। প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে শত্রুকে গুঁড়িয়ে দিয়ে থাকে।

প্রতিবেশী নামধারী ১২-১৪টি অসভ্য-বর্বর-জেহাদি নেকড়ে দেশ পরিবেষ্টিত হয়ে বেঁচে থাকতে হলে ইজরায়েলকে সিংহ হতেই হবে। আজকের ইজরায়েল যেন সত্যিই সেই 'সিংহ'। ইজরায়েল ভ্রমণের সময় এমন কিছু বিষয় এই প্রতিবেদকের চোখে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালির কাছে যা ইউটোপিয়া মনে হবে।

দেশটিতে কোনো ধর্মঘট হয় না। রাস্তা দখল করে মিটিং-মিছিল, বিক্ষোভ, বনধ্, 'ভেঙে দাও-গুঁড়িয়ে দাও'-এর রাজনীতি হয় না। ইজরায়েলে থাকাকালীন এই প্রতিবেদক আরবীয় বিনিয়োগে চলা একটি রেল কোম্পানিতে একটিমাত্র শ্রমিক বিক্ষোভের ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। চাকরি, কর্মসংস্থান বা রোটি-কাপড়া-মকানের জন্য এই দেশে মিটিং-মিছিল হয় না। নির্বাচনের সময়, সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সভা-সমাবেশ হয়। দেশের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ তীব্র। কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁরা দৃঢ়ভাবে তাঁদের সরকারের পাশে থাকেন। হামাস, হেজবোল্লা, হুথিদের মতো জেহাদি শক্তির বিরুদ্ধে যেকোনো লড়াই লড়তে তাই পিছপা হয় না ইজরায়েল।

ইজরায়েলে রয়েছে প্রায় ২০ শতাংশ মুসলমান। তাদের অনেকেই পেশায় ব্যবসায়ী। সরকারের থেকে সবরকম সুযোগসুবিধা তারা পেয়ে থাকে। সরকারি নীতি 'জেহাদি খতম' জানা সত্ত্বেও সেদেশে তারা নিশ্চিন্তে রয়েছে। সরকার তাদের সুরক্ষা প্রদান করে থাকে। পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও ইজরায়েল ছেড়ে তারা জর্ডন, সৌদি আরব বা বাহরিন যাবে না। তাদের অনেকেই আবার ইজরায়েল অন্ত প্রাণ। এরকম একজন ইজরায়েলি মুসলমানের বাড়িতে দু'মাস ভাড়া ছিল এই প্রতিবেদক। তবে তাদের মধ্যেও ১-২ শতাংশ রয়েছে ইয়াসিন মালিক, বুরহান ওয়ানির মতো। তবে তেলআভিভ, হেব্রন, হাইফাতে স্থানীয় কোনো মুসলমানের বাড়ি নিরাপত্তাবাহিনী ঘিরে ফেলেছে এমন দৃশ্য কিন্তু দেখা যায় না।

১৯৪৮-এ জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামিক জেহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে ইজরায়েল। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের নিকেশ করাটাই ইজরায়েলের নীতি। ২০২৩-এর ৭ অক্টোবরের ভয়াবহ ইহুদি গণহত্যার পর গাজা, ওয়েস্ট ব্যাংক, জেরুজালেমের আরাফাতি জেহাদি, হামাস জঙ্গিদের ছাড়বে না ইজরায়েল সরকার। তাঁদের পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে আমেরিকা, চীন, রাশিয়া কী বললো, অন্যান্য দেশ কী প্রতিক্রিয়া দিল তাতে তোয়াক্কা করে না ইজরায়েল। কোথায় সেকু-মাকু-পাকুরা কী আন্দোলন করল তাতে কিছুই এসে যায় না ইজরায়েলের। মেধা, শ্রম, ক্ষত্রিয়তা, আত্মনির্ভরতার আদর্শ গ্রহণ করে তাঁরা আজ পরাক্রমী হয়ে উঠেছে। লাপিড, শ্যারন, বেঞ্জামিন, বেন গুরিনের মতো সেনাপতি তৈরি করেছে ইজরায়েল। আগামীদিনেও তাঁদের মধ্যে থেকে আরও সেনাধ্যক্ষ উঠে আসবেন।

ইহুদি জাতির সঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দু জাতির অবস্থা একমাত্র তুলনীয়। ১৯৪৬ সালে বাঙ্গালি সাক্ষী থাকে কলকাতা ও নোয়াখালী হিন্দু নরসংহারের। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয় ভারত। পাকিস্তানের অন্তর্গত হয় বঙ্গভূমির বৃহদংশ। হিন্দু বাঙ্গালির রক্তে রঞ্জিত হয় পূর্ববঙ্গের বিরাট অংশ। অথচ ঊনবিংশ শতক এবং বিংশ শতকের প্রথম পর্যায়ে মেধা, আধ্যাত্মিকতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাধনায় সমগ্র বিশ্বে বাঙ্গালি ছিল অনন্য। সেই সময় না ছিল মার্ক্সবাদ বা মোল্লাবাদের তীব্র প্রভাব, না ছিল বাঙ্গালি জাতি দুটো ভাত-ভিক্ষার মুখাপেক্ষী। বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের পাশাপাশি নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল হিন্দু বাঙ্গালির। আত্মত্যাগে পিছপা হতো না এই জাতি। বাঙ্গালি জানত যে তাঁরা জন্ম হতেই মাতৃভূমির জন্য বলিপ্রদত্ত। বাঙ্গালি হিন্দুকে সম্ভ্রম ও ভয় করতে বাধ্য হয়েছে অত্যাচারী, লুণ্ঠনকারী ব্রিটিশ শাসক। বহু বছরের দীর্ঘ ইসলামি শাসন এবং তারপর ব্রিটিশ শাসনে শাসকের অত্যাচার, লুঠ, ধর্ষণ, ধর্মান্তরণ, গোলামির গ্লানির কথা বাঙ্গালি বিপ্লবী ও মনীষীরা জানতেন, স্মরণে রাখতেন জহরব্রত, বারো ভুঁইয়া, মহারাজ প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, চিলা রায়দের লড়াইয়ের ইতিহাস। মন্দির, আখড়ার গুপ্ত স্থানে বিপ্লবীরা পাঠ করতেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য। শরীরচর্চার পাশাপাশি পালন করতেন বীরাষ্টমী ব্রত। তাঁদের উদ্বুদ্ধ করত গীতার কর্মযোগ ও স্বামীজীর বাণী। ১৯৫০ থেকে ২০২৫— আরব, রাশিয়া, চীন থেকে আসা দুই বিজাতীয় 'ম' (মোল্লাবাদ-মার্ক্সবাদ)-এর মতাবাদের দাপাদাপিতে পূর্ববঙ্গ থেকে উচ্ছেদ হয়ে, সব হারিয়ে উদ্বাস্তু, পথের ভিখারি হয়েছে বাঙ্গালি। তার শেষ হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গও হয়ে উঠেছে নরক। ■

ফঃ ৪

জাতীয় গ্রন্থাগারে লঘু উদ্যোগ ভারতী'র অভ্যাস বর্গ এবং ক্ষেত্রীয় সম্মেলন

গত ২৭ জুন কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে লঘু উদ্যোগ ভারতী পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে অভ্যাস বর্গ এবং ক্ষেত্রীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বর্গ ও সম্মেলনের বিষয় ছিল 'উদ্যমী সম্মেলন ২০২৫ : রাইজিং ইস্ট'। সম্মেলনের প্রথম সত্রে উপস্থিত ছিলেন লঘু উদ্যোগ ভারতীর অখিল ভারতীয় সভাপতি ঘনশ্যাম ওঝা, অখিল ভারতীয় মহামন্ত্রী প্রকাশ চন্দ্র, পূর্বতন রাষ্ট্রীয় সভাপতি এবং বর্তমানে পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের প্রভারী ওমপ্রকাশ মিত্তল, রাষ্ট্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রভারী প্রবীণ আগরওয়াল এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি দেবীপ্রসাদ চৌধুরী। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত। তিনি বলেন, আচরণগত রূপান্তরের জন্য মানসিকতা হলো মূল চাবিকাঠি। যে কাজ যা মন ও অভ্যাসে পরিবর্তন আনে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের জন্য পঞ্চ পরিবর্তন অপরিহার্য। তা হলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে 'স্ব'-এর ভাব আনয়ন, সামাজিক সমরসতা, পারিবারিক মূল্যবোধ, নাগরিক কর্তব্য এবং পরিবেশ সুরক্ষা। অভ্যাসবর্গ পরিচালনা ও প্রতিস্থাপনা করেন প্রকাশ চন্দ্রজী, ঘনশ্যামজী, ওমপ্রকাশ মিত্তলজী এবং প্রবীণজী।

সম্মেলনের দ্বিতীয় সত্রে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় রেল, প্রচার ও সূচনা, ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায় প্রণালী এবং সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল, সিএমডি ড. শুভ্রাংশু কুমার আচার্য। এই সত্রে ভারতের শিল্প ভবিষ্যৎ এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে পদ্মশ্রী ভূষিত বিশিষ্ট শিল্পপতি সজ্জন ভজনকাকে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, পঞ্চাশ বছর আগে একটি ছোটো প্রচেষ্টায় শুরু হওয়া তাঁর কোম্পানি সেঞ্চুরি প্লাই আজ দেশের একটি বড়ো শিল্পে পরিণত হয়েছে। তিনি ক্ষুদ্র শিল্পকে বড়ো শিল্প যাত্রার প্রথম ধাপ হিসেবে বর্ণনা করেন। অভ্যাস বর্গ ও সম্মেলন পরিচালনা করেন প্রবীণ আগরওয়াল ও বিজয় আগরওয়াল এবং পরিশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দেবীপ্রসাদ চৌধুরী।

সিটিজেনস্ এমপাওয়ারমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে আলোচনাসভা

গত ২৬ জুন সিটিজেনস্ এমপাওয়ারমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত হয় 'গণতন্ত্রের সংকট ও নাগরিক সচেতনতা'-শীর্ষক একটি আলোচনাসভা। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, সিটিজেনস্ এমপাওয়ারমেন্ট ফোরামের ট্রাস্টি দেবাশিস লাহিড়ী এবং ভারত চেম্বার অফ কমার্সের পূর্বতন সভাপতি এনজি খৈতান। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে সভার সূত্রপাত হয়। এরপর 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্' গানটি পীতারুণ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। সভাটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী অভিজিৎ চক্রবর্তী। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ভারতে জারি হয় জরুরি অবস্থা। গ্রেপ্তার হন জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজী দেশাই, অশোক মেহতা, অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবাণী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস-সহ বিশিষ্ট বিরোধী নেতারা। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, তার নেতৃত্বাধীন সরকার এবং কংগ্রেস দলের চরম স্বৈরতন্ত্রের সাক্ষী থাকে গোটা দেশ। গণতন্ত্র এবং সংবিধান হত্যার সেই কালো দিনগুলি সম্পর্কে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন অভিজিৎবাবু। সভার মুখ্য বক্তা ছিলেন সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে অতীতের স্মৃতিচারণ। যেদিন দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি হয় সেই দিন মধ্যরাতে গ্রেপ্তার

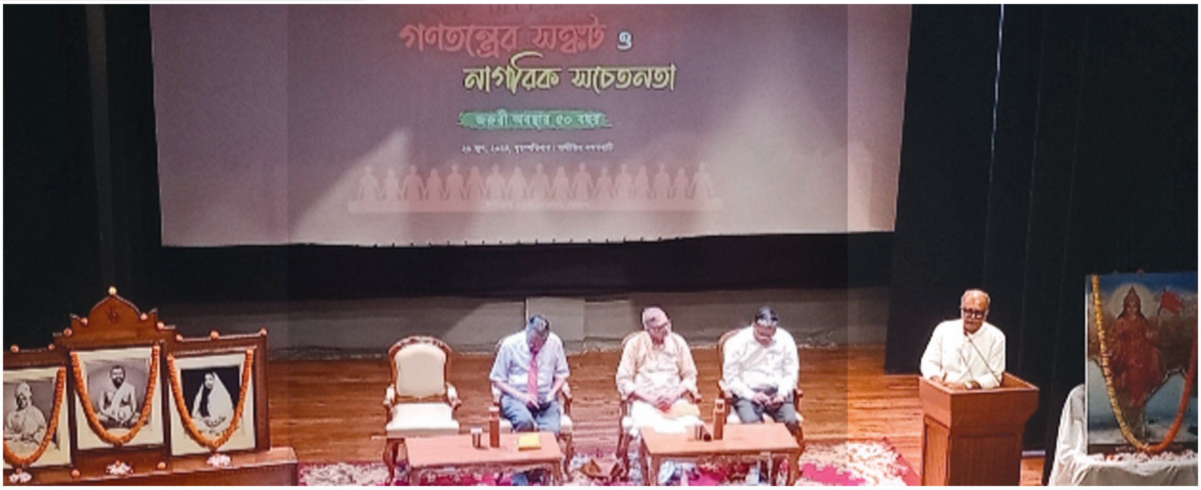

হয়েছিলেন তিনি নিজে। তাঁর সঙ্গে কারাবরণ করেছিলেন আরও অনেকেই। কলকাতায় ২৬, বিধান সরণি-স্থিত সঙ্ঘ কার্যালয়ের দরজা ভেঙে তাঁদের ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। মিথ্যা অভিযোগে তাঁদের সকলকে অভিযুক্ত করে জেলবন্দি করা হয়। দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করে, মিথ্যা মামলা দায়ের করে এইভাবে অসংখ্য বিরোধী নেতা, কার্যকর্তাদের বন্দি করা হয়, এবং তাঁদের অনেককেই বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়। এর প্রতিবাদে দেশজুড়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করা হয় এবং সারা দেশে ১ লক্ষ ৭০ হাজার জন কারাবরণ করেন। জরুরি অবস্থার দিনগুলি এবং জেলের অভ্যন্তরে তাঁদের অতিবাহিত জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বার বার আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন শ্রীগোস্বামী। তিনি বলেন, জেলের মধ্যে আদর্শবান ও বড়ো মাপের নেতাদের সংস্পর্শে তরুণরা আসার এবং নানা বিষয়ে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। জরুরি অবস্থা চলাকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, সাধারণ মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, সংসদে অসাংবিধানিক উপায়ে ৪২তম সংবিধান সংশোধনী পাশ, এমনকী অনৈতিকভাবে সংবিধানের প্রস্তাবনা পরিবর্তনের বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করেন তিনি। এরপর এদিনের আলোচনাসভার বিশেষ অতিথি এনজি খৈতান বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে 'আইসি গোলোকনাথ বনাম পঞ্জাব রাজ্য সরকার' এবং 'কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য সরকার' মামলা এবং সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিশদ উল্লেখ। সেই সময়ে কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নানা অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত এবং তার প্রেক্ষিতের ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের দেওয়া নানা ঐতিহাসিক রায়ের ফলেই যে চরম স্বৈরতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করেন ইন্দিরা গান্ধী, সেই বিষয়টি এনজি খৈতানের বক্তব্যে উঠে আসে। তৎকালীন সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা এবং সাধারণ মানুষের উপর কংগ্রেসি নেতাদের অত্যাচারের নানা উদাহরণ ও পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের পর ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন ফোরামের ট্রাস্টি ও বিশিষ্ট আইনজীবী দেবাশিস লাহিড়ী। তিনি বলেন যে, সব রাতের শেষেই ভোর আসে। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর অবসান হয় জরুরি অবস্থার। পতন হয় ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সরকারের। মোরারজী দেশাই নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের অধিবেশন ডেকে ইন্দিরা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এছাড়াও সংসদে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী পাশ করানোর মাধ্যমে ৪২তম সংশোধনীর অন্তর্গত নানা অগণতান্ত্রিক ধারা, উপধারাগুলিকে বাতিল করা হয়। দেবাশিসবাবু বলেন যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র সংকটমুক্ত নয়। ভারতীয় সংবিধান প্রতি মুহূর্তে পদদলিত হচ্ছে এই রাজ্যের নানা প্রান্তে। সংবিধান-প্রদত্ত অধিকার হতে বঞ্চিত এই রাজ্যের অসংখ্য মানুষ। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও এই রাজ্যে আজ প্রশ্নের মুখে। এমতাবস্থায় অতীত ইতিহাস এবং নাগরিক কর্তব্য যেন বিস্মৃত না হয় প্রবুদ্ধ সমাজ। গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার শপথগ্রহণের মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

মহারাজা শশাঙ্ক স্মৃতি মঞ্চ এবং কলকাতার স্নে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ২০ জুন মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে জল ট্যাঙ্ক মোড়ে ঐতিহ্যবাহী 'যোগেন্দ্র নারায়ণ মিলনী' অর্থাৎ গ্র্যান্ট হলে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সেমিনারের মাধ্যমে পালন করা হলো পশ্চিমবঙ্গ দিবস।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শততম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৬ জুন মধ্য কলকাতায় মহাজাতি সদনে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির উদ্যোগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শততম প্রয়াণ দিবসের স্মৃতিতে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সমিতির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস, সঞ্চালনায় ছিলেন সমিতির সদস্য, সাহিত্যিক গোপাল চক্রবর্তী। 'জয় হিন্দ', 'বন্দে মাতরম্', 'দেশবন্ধু অমর রহে' ধ্বনির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা হয়। সমিতির সভাপতি এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. শিশুতোষ সামন্ত দেশবন্ধুর তৈলচিত্রে প্রথম মাল্যদান করেন। তারপর উপস্থিত সকলে ফুলের মালা ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন, মহাজাতি সদনের সচিব নুরুল হুদা, ১০৩ বছর বয়সি স্বাধীনতা সংগ্রামী হরেন বাগচী বিশ্বাস, দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জনের দৌহিত্রী বৃন্দা শ্রীনিবাসন, দেশবন্ধুর ভাইয়ের নাতি প্রসাদরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্রে মেজদা শরৎচন্দ্র বসুর দৌহিত্র অভিজিৎ রায়, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রিসার্চ ব্যুরোর সম্পাদক তপন ভট্টাচার্য, চন্দননগর ইয়ংমেন কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনিল কুমার ঘোষ, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পরিবারের সদস্যা সুতপা বিশ্বাস, কল্পনা বিশ্বাস, এমিলি বিশ্বাস প্রমুখ বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানে তাঁদের বক্তব্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু, বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী, সক্রিয় রাজনীতিক ও বিশিষ্ট আইনবিদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিচারণ করে অনেক বক্তার কণ্ঠেই ধ্বনিত হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা দু'লাইনের শ্রদ্ধাঞ্জলি— 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ / মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।' তাঁদের বক্তব্য শেষে অনেকেই গানের মধ্যে দিয়ে দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির উদ্যোগে চাঁদপুর সম্মিলনী সভাগৃহেও এদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে চারাগাছ বিতরণ

গত ২৭ জুন নদীয়া জেলার বীরনগর গ্রামে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে চারাগাছ বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির। এদিন সকাল থেকেই গ্রামে ছিল সাজ সাজ রব। গ্রামবাসী সকলেই রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। তারপরেই শুরু হয় চারাগাছ বিতরণ অনুষ্ঠান। চারশো জন গ্রামবাসীর হাতে আম, বিলতি আমড়া, লেবু ও সেগুনগাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের অন্যতম সদস্য মিলন খামারিয়া, সমাজসেবী সঞ্জয় চক্রবর্তী, অখিল মণ্ডল, গুরুদাস বিশ্বাস, রমা রায়, দীপিকা মণ্ডল দাস প্রমুখ।

আমের অমৃত কথন

মণীন্দ্রনাথ সাহা

গরম মানেই আমের রাজত্ব। আমকে ফলের রাজা বলা হয়। শুধু স্বাদের দিক থেকেই ফলের রাজা নয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন— এর বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্যগুণও আছে। সে হিসেবে আমের স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো একঝলক দেখে নেওয়া যাক। আম ক্যানসার প্রতিরোধী। ত্বককে ভিতর থেকে পরিষ্কার করে। কোলেস্টোরেলের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। চোখকে পর্যাপ্ত সুরক্ষা দেয়। পরিপাক ক্রিয়ায় প্রভূত সাহায্য করে। বডিস্ক্র্যাব্ হিসেবেও ভালো। অ্যালকালাইজ করে সম্পূর্ণ শরীর, হিটস্ট্রোকের প্রকোপ থেকে শরীরকে বাঁচায় এবং রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। তাই পুষ্টিবিদরা বলেন, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ভিটামিন খান। অর্থাৎ আম খান, আম। পাকা আম খান। পোড়া আমের সরবত খান। কাঁচামিঠা আম খান।

আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের ফলের সমারোহ দেখা যায়। শুধু ফলই-বা বলি কেন। ফল, সবজি, মায় নলেন গুড় পর্যন্ত। ফল, সবজি, মিষ্টির চরিত্র বহুদিন হলো হারিয়েছে মরসুমের প্রতীক্ষায়। এখন সারা বছরই পাওয়া যায় কমলালেবু কিংবা ফুলকপি অথবা নলেন গুড়। ব্যতিক্রম শুধু আম। বাঙ্গালির প্রিয় ফলের জন্য আজও দিন গুনতে হয় ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে। 'এপ্রিল' যাব যাব করে আর 'মে' দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে টোকা দিয়ে জানান দেয় ফলের রাজার আসার সময় হয়ে গেছে।

এই আমকে কে, কবে, কোথা থেকে, কী প্রকারে আবিষ্কার করেছে বা এনেছে তার সঠিক ব্যাখ্যা মনে হয় কেউ দিতে পারবে না। তবে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলমে আমরা দেখতে পাই বনজ্যোৎস্নার সঙ্গে ধুমধাম করে আমের বিবাহের কথা এবং তাতে অগাধ প্রশস্তি শ্লোকের দেখা মেলে। ভাগবত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গে বারবার উঠে এসেছে চূতবৃক্ষের উল্লেখ। রামায়ণে দেখি সীতা হনুমানকে বলছেন— 'সীতা বলিলেন বাছা হইল স্মরণ। অমৃতের ফল কিছু করহ ভক্ষণ।। হাত পাতি লয় বীর পরম কৌতুকে। অমনি ফেলিয়া দিল আপনার মুখে।। অমৃত সমান সেই অমৃতের ফল। ফল খাইয়া হনুমান হইল বিকল।।' এরপর হনুমান রাবণের বাগানে গিয়ে 'সাধারণ' ফলটি অজস্র খায় এবং কিছু ফল এপারে নিয়ে আসে। কে বলতে পারে হয়তো তার জন্যই তামিল শব্দ 'ম্যাঙ্কো'-র অপভ্রংশ ইংরেজি ম্যাঙ্গো কিনা।

মহাভারতের বনপর্বে দেখা যায় পঞ্চপাণ্ডব কাম্যকবন ত্যাগ করে অন্য একটি বনে এসে যখন উপস্থিত হলেন তখন সেই তপোবনে একটি আমগাছে মাত্র একটি আম দেখে দ্রৌপদী অর্জুনকে সেই অসময়ের আম পেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন— 'অসময়ে আম্র এক তরু ডালে দেখি। অর্জুনে কহিলা কৃষ্ণা পরম কৌতুকী।। আশ্চর্য দেখহ দেব, এ বড় বিস্ময়। এই আম্র পাড়ি দেহ, কৃপা যদি হয়।। এত শুনি ধনঞ্জয় জুড়ি দিব্য শর। দিলেন পাড়িয়া আম্র কৃষ্ণার গোচর।।' অর্থাৎ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের পূর্বেই ভারতে আমের অস্তিত্ব ছিল।

প্রবাদের মতো আজও চালু আছে যে কথা, তা হলো— দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র আর ফলের মধ্যে বহুরূপী আম। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আম নিয়ে লিখে গেছেন— 'বল, বর্ণ, রক্ত, মাংস, শুক্র বৃদ্ধি করে/কিছু শ্লেষ্মাকর, কিন্তু বায়ুপিত্ত হরে/কচি আমের ঝোল খেলে দেহ ঠাণ্ডা হয়/সিদ্ধ আম, স্নিগ্ধ গুণে মেদ করে ক্ষয়/কেশীচূর্ণ উপকারী বমি অতিসারে/ বোঁটার আঠার তেলে চুলকনা সারে/পাতার রসেতে নাশে রক্ত আমাশয়/ছাল বেটে লেপে দিলে ব্যথা ভালো হয়।'

ফা-হিয়েনের লেখায় রয়েছে, গৌতম বুদ্ধকে গোটা একটা আমের বাগান উপহার দিয়েছিলেন 'আম্রপালিকা' নাম্নী এক গণিকা। বুদ্ধ সেই বাগানে এসে মাঝে মধ্যেই হতেন ধ্যানমগ্ন। সে না হয় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগের ঘটনা। আম কাহিনি তারও আগে থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। তা জানা যায় একটি পুরাণকথা থেকে। 'সূর্যের মেয়ের উপর এক মায়াবী ডাকিনীর ভয়ংকর রাগ। কারণে অকারণে তাকে বিব্রত করত

সর্বক্ষণ। এই ডাকিনীর হাত থেকে বাঁচতে সূর্যকন্যা চলে এলেন মর্ত্যে। একটি পদ্মের রূপে প্রস্ফুটিত হলেন পৃথিবীর সম্রাটের সরোবরে। রাজা সেই পদ্ম দেখেই পড়লেন প্রেমে। রোজ দিবারাত্র পদ্মের কাছে আসা যাওয়া তার হয়ে উঠল নিত্যকর্ম।

এতে ওই ডাকিনী আরও ক্ষিপ্ত। সে এসে মায়াজালে এক রাতে ভস্ম করে দিল পদ্মকে। রইল শুধু ছাই। পদ্ম নেই দেখে দুঃখে রাজা সরোবর বুজিয়ে দিলেন। সেখানে জন্ম নিল একটি আমের গাছ। একদিন গাছপাকা আম পড়ল মাটিতে। সেই মাটিতেই মিশে আছে ছাইয়ের আকারে সূর্যকন্যা। আমের স্পর্শে কন্যা ফিরে পেল প্রাণ। রাজা আনন্দে আত্মহারা। সূর্যকন্যা হলেন পৃথিবীর রানি।'

আমের চাষ আমাদের দেশের প্রত্যেক প্রান্তে কম-বেশি দেখা যায়। ভারতের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে সবচাইতে বেশি আম চাষ হয় উত্তর প্রদেশে। মোট এলাকার ২৬.১৫ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে চাষ হয় ৯.২ শতাংশ। ভারতবর্ষে মোট ১২,৮৭,৯৭২ হেক্টরেরও বেশি জমিতে আম চাষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১,৪০,০০০ হেক্টর জমিতে চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মালদা জেলায় ৬৫,০০০ হেক্টর জমিতে আম চাষ হচ্ছে। আম চাষের পরিমাণের দিক দিয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ।

বঙ্গললনাদের যেমন নামের শেষ নেই— 'রসলা, কমলা, বিমলা, সরলা, এনাক্ষি, মিনাক্ষী, নীতা, সীতা, নমিতা, সুমিতা, মধুমিতা, পারমিতা' ইত্যাদি। তেমনি আমের নামেরও বোধ করি শেষ নেই— 'হিমসাগর, ল্যাংড়া, বোম্বাই, জাহাঙ্গীর, হাপুন, আলফানসো, ব্ল্যাক আলফানসো, চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, সৌন্দর্য, ভাদু, তলবি, তোতাপুরি, কালাপাহাড়, দিলসাদ, লস্করসেকন, লজ্জতবক্স, তাইমুরিয়া, সোরিপেয়ারফুলি, মানিকজী রুস্তমজী, স্বর্ণজাহাঙ্গীর, হেমাউদ্দিন, নীলউদ্দিন, আউরোমানিয়া, মোলায়েমজাত, কোহিনুর, রইসপসন্দ, ইয়োলো মুন্ধুরাদো, বাগানপল্লী, কালুয়া, রত্না, বিশ্বনাথ, বৃন্দাবনি, আশ্বিনী' ও আরও অনেক।

আমের জন্মবৃত্তান্ত ও চরিত্র জানতে আনন্দে মন ভরে ওঠে। যেমন—

বোম্বাই : নামেই বোম্বাই আম। মহারাষ্ট্রের রাজধানীর বা গোটা মহারাষ্ট্রের সঙ্গেই এই আমের কোনো সম্পর্ক নেই। গোপালভোগ আর কালুয়া নামের দুই সম্প্রদায়ের মিলনের ফল এই বোম্বাই আম। খেতে সুস্বাদু। ২৪ পরগনায় এর রমরমা বেশি।

সিন্ধু : সিন্ধু নদ নয়, আম। আম অথচ আঁটি নেই, ভাবা যায়? দেশ বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছে এই আম। যেমন সুস্বাদু তেমনি মন মাতানো গন্ধ। বিখ্যাত আলফানসো আর রত্না আমের সংকরায়ন হলো এই সিন্ধু আম। বীজবিহীন আঙ্গুর ফলনের পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে আঁটিবিহীন সিন্ধু তৈরি করেছে মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন বিদ্যাপীঠের আঞ্চলিক ফল গবেষণা কেন্দ্র। আঁটিবিহীন বা সিডলেস বললেও এতে আঁটি আছে তবে ওজন মাত্র সাত গ্রাম। সিন্ধুতে এ তো বিন্দুই বটে!

নীলম : মহারাষ্ট্রে এক ধরনের আম হয়, নাম নীলম। আশ্চর্য আম এই নীলম। যেমন মিষ্টি তেমনি স্বাদ। তবে মিষ্টি ও স্বাদ এ দুটোই তার বৈশিষ্ট্য নয়। এর বৈশিষ্ট্য হলো— 'এই আম কাটা মাত্রই এর ভেতর থেকে বেরিয়ে যায় মৌমাছি। হ্যাঁ, মাত্র একটিই। বেশ রসালো ও মিষ্টি এই আমে মধুমক্ষিকা ঢোকে কী করে— তা আজও রহস্য।'

দশেরি : শশার মতো দেখতে উত্তর ভারতের মুখ্য আম দশেরি। ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম। গন্ধ ভালো, আঁশহীন, রং হলদে, ছাল পাতলা, পাকা ফল অনেকদিন পর্যন্ত থাকে।

সৌন্দর্য : মধ্যপ্রদেশবাসী আমের স্বাদে এতই মুগ্ধ যে তাদের একটি আমের নাম সৌন্দর্য। রিওয়া জেলায় উৎপন্ন এই আমের বৈশিষ্ট্য হলো এর আঁটি এতই নরম যে অসতর্কতায় সেটিও অনায়াসে পেটে চলে যেতে পারে।

কিষাণভোগ : সন্দেশ নয়, আম। যার রমরমা রাজস্থানে। স্বাদে ও সুগন্ধে মন উতলা করে তোলে।

আলফানসো : আম নিয়ে ব্যবসা করে যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যাবে সেটা প্রথম মুম্বইয়ে চালু করেন এক পর্তুগিজ বণিক। তার নাম আলফানসো। তারই নামে মহারাষ্ট্রের এই আমটি ভারতের মধ্যে সব থেকে স্টার স্ট্যাটাস প্রাপ্ত। এই আমই এখন সব থেকে বেশি যায় বিদেশে। কলকাতাতেও পাওয়া যায় ১২টার একটা প্যাকেট। দাম ৩০০ টাকার ওপর। বোম্বাইয়ে এই ফলটিকে সংরক্ষিত করে বিরাট শিল্প গড়ে উঠেছে। আমটা ডিম্বাকৃতি, নাকবিহীন, ফলত্বক পাতলা, আঁশবিহীন, খুব সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত।

আমের সঙ্গে মিশে আছে নবাবি আমলের ইতিহাস। নবাব ফেরাদুনজার মা রাইসুন্নেসা বেগমের নামে বেগম পসন্দ, ফেরাদুনজার পিতা ফেরদিউম সাহেবের নামে ফেরদিউম পসন্দ। নবাব মুবারকদৌল্লার পৌত্র নবাব সফদার জংবাহাদুরের নামে সফদার পসন্দ নামকরণ হয়। নাটোরের রানি ভবানীর বিশেষ পছন্দের আমটির নামকরণ করা হয় 'ভরানীচৌরস'। তোতাপাখির ঠোঁটের মতো গোড়ার দিকটি দেখতে বলে 'তোতা' আমের নামকরণ করা হয়। ওই আমটি নবাব ওয়াসিম আলি মির্জা তাঁর বাগান থেকে নবাব রইস মির্জাকে উপহার দেন। রইল মির্জা এর নামকরণ করেন 'চম্পা'।

মির্জাপসন্দ আমটির উৎপত্তি মির্জা খোকার বাগানে। কথিত আছে, নবাব নাজিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ মির্জাসাহেব ছেড়ে দেন এই আমের একটি চারার বিনিময়ে। বর্তমানে অবশ্য এসব আমের অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।

হুগলিতে পাওয়া যায় সোরি, পেয়ারফুলি, গোলাপখাস। মুর্শিদাবাদে তো এতো আমের বৈচিত্র্য আছে যে, কয়েক কিলোমিটার দূরের বাজারে আমের বিভিন্নতা দেখা যায়। মুর্শিদাবাদের রইসবাগকে আমের ল্যাবরেটরি বলা যায়। নবাবি আমলে রইসবাগ, হুমায়ুনমঞ্জিল, মির্জাখোকার বাগান, গুলাববাগ, ফৈয়াজবাগ, লবাববাগ, মোতিঝিলবাগ, দারোগা আঞ্জুমানবাগ, রাজওয়ালাবাগ, গোলাপবাগ, মোবারক মঞ্জিল, হাকিম আগামহম্মদের বাগান ইত্যাদি আমবাগানগুলিতে কার্যত কায়েম হয়েছিল আম সাম্রাজ্য। এমন বাগান ছিল যেখানে একসঙ্গে প্রায় ১৫০ জাতের আম মিলত। এই বাগানগুলির মধ্যেই বাগানবাড়ি থাকত। আমের মরসুমে সেখানে মজলিশ বসত। নাচ, গান, মুশায়ারায় মুখর হয়ে উঠত বাগান। সেখানে কাশিমবাজারের রাজা, নসিপুরের রাজারাও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। অতিথি আপ্যায়নের জন্য আম ছাড়া আম পোলাও নামে বিশেষ 'ডিস' তৈরি করা হতো।

উত্তরবঙ্গে বেশি পাওয়া যায় লক্ষ্মণভোগ, ফজলি, হিমসাগর, ল্যাংড়া, ভাদু আর আশ্বিনী। তবে ইদানীং আম্রপালী ও মল্লিকারও বাজার তৈরি হয়েছে। হিমসাগরের দাপাদাপি সবচেয়ে বেশি উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়।

নবাব, বাদশা, খলিফা, রাজা, রানি, অভিজাত পরিবার ছাড়া আম কালচার অর্থহীন। আর সেজন্যেই তো কহিতুর, কালাপাহাড়, আলফানসোর মতো স্পর্শকাতর আমগুলিকে টুসিতে তুলো দিয়ে পাড়া হতো। এগুলিকে রাখাও হতো তুলোর বিছানায় শুইয়ে। আজ যদি আমটিকে এপিঠে রাখা হয় তবে পরেরদিন অপর পিঠে শুইয়ে দিতে হবে। আম খাবার মতো তৈরি হয়েছে কিনা তা বোঝা যেত বিভিন্ন আমের বিভিন্ন লক্ষণ দেখে। লস্কর সেকন, লজ্জত বক্স, চম্পা এসব আমের ক্ষেত্রে তাদের খোসার

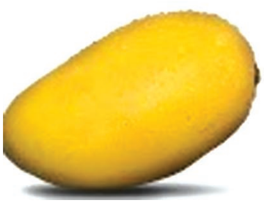

কালো ছিট ছিট দাগ দেখে বোঝা যায় সেগুলি খাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। নাজিম পসন্দ আমকে ঝুড়িতে করে কুয়োর জলে চুবিয়ে ঠান্ডা গরম পদ্ধতিতে খাওয়ার উপযুক্ত করে তৈরি করা হতো।

নবাবি আমগুলিকে কাটার জন্যও বিশেষ এক ধরনের সরু ছুরি ব্যবহার করা হতো। আঁটিতে ছুরি লাগলে নাকি আমের স্বাদের পরিবর্তন ঘটে যেত। খোসা ছাড়ানোর পর আস্ত আমটাই পরিবেশন করা হতো। তবে ফজলি, দিলসাদ আমকে লম্বাভাবে ফালাফালা করে কাটা হতো। রানি, বোম্বাই, হিমসাগর, সফদারপসন্দ, নাজিমপসন্দ প্রভৃতি আম খাওয়ার প্রায় তিন ঘণ্টা আগে বোঁটার দিকে কেটে জলে ভিজিয়ে রাখার রীতি প্রচলিত ছিল। একের পর এক আম খাওয়ার সময় স্বাদের তফাত বোঝার জন্য 'আনানাস' আম খাওয়ার রীতি ছিল। এর স্বাদ আনারসের মতো। অনেকেই বলেন, আনারসের সঙ্গে সংকর প্রথায় এর সৃষ্টি।

নবাবি আম আলোচনায় যে আমের উল্লেখ না করলে আম আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়বে তাকে বলা যেতে পারে আমের মহারাজা কহিতুর। মুর্শিদাবাদের এই আম নবাবদের কাছ থেকেও সমীহ আদায় করে নিয়েছে। বাদশাহি মেজাজের প্রতিফলন এই আমের চরিত্রে। নবাব ওয়ালাকাদার সৈয়দ হোসেন আলি মির্জার তৃতীয় পুত্র নবাব আলি মির্জা এই আমের প্রবর্তন করেন। কালাপাহাড় প্রজাতির আমের সঙ্গে বিশেষ সংকরায়নের মাধ্যমে তৈরি এই আম। এই আম তুলোর টুসিতে করে পেড়ে প্রতিটি আমকে রাখতে হবে তুলোর বাক্সে। আজ যে পিঠে রাখা হবে কাল তাকে ঘুরিয়ে অন্য পিঠে রাখতে হবে। নচেৎ দাগ ধরে যাবে। লোহার ছুরি বা বঁটির প্রশ্নই নেই। হয় রুপোর ছুরি দিয়ে কাটতে হবে নয়তো বাঁশের ছাল তীক্ষ্ণ করে সেটা দিয়ে কাটতে হবে।

জেনে রাখবেন, আমটি কেটে রেখে অন্য কাজে গেলে চলবে না। এ কিন্তু নিঃসঙ্গতা মোটেই পছন্দ করে না। খোসা ছাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে না খেলে অভিমানী এই আম কয়েক মিনিটে স্রেফ বরফের মতো গলে জল হয়ে যাবে। একই রকম সেনসিটিভ রামদাসপুরের তলবী আম। এই আমও টুকরো করে রেখে দিলে একটু পরেই গলে জল হয়ে যায়। গাছপাকা আম খেতে সুস্বাদু নয়। তাই ডাঁশা থাকতে আম গাছ থেকে পেড়ে, ফেলতে হবে। তারপর চোখে চোখে রেখে তাকে পাকালে স্বর্গস্বাদ পাওয়া যায়।

একটা আমগাছ কত বড়ো হতে পারে এবং বছরে কতমণ ফল দিতে পারে? জানা গেছে যে, পঞ্জাবের চণ্ডীগড়ের পুলাইল গ্রামে ২৭০০ বর্গগজ দখল করে দাঁড়িয়ে আছে অতিকায় এক আমগাছ। এটি বছরে ৪৫০ মণ ফল দেয়।

রাজা ঠিক রাজার মতোই থাকে। আমও তাই আছে আজও। সব ফল, সব সবজি হাইব্রিড অথবা কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে সারা বছরই ফলন হয়। কিন্তু আমের একগুঁয়েমিকে বাগে আনতে পারেনি কৃষি বিজ্ঞানীরা। বিচ্ছিন্নভাবে অন্য মরসুমে কিছু আমের ফলন হলেও আমজনতার রসনার সমর্থন না পাওয়ায় সেসব আদৌ ধোপে টেকে না। আজও সে এক এবং অদ্বিতীয়। যেহেতু তার অপর নাম অমৃত। ☐

ভুবনেশ্বরের চৌষট্টি যোগিনী মন্দির

দেবাশিস চৌধুরী

ভারতবর্ষের বুকে মাত্র চারটি চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের কথা শোনা যায়। দুটি মধ্যপ্রদেশে এবং দুটি ওড়িশাতে। এই চারটি মন্দিরের মধ্যে নবম শতাব্দীতে নির্মিত একটি মন্দির রয়েছে ভুবনেশ্বর রেল স্টেশন থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে হীরাপুরে। পুরাণ অনুযায়ী, মা দুর্গা যখন শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধরতা, তখন মায়ের থেকে উৎপন্ন হন অষ্টমাতৃকা— ১. ব্রাহ্মণী, ২. মাহেশ্বরী, ৩. কৌমারী, ৪. বৈষ্ণবী, ৫. বারাহী, ৬. ইন্দ্রাণী, ৭. চামুণ্ডা ও ৮. মহালক্ষ্মী। ওই আটজন মাতৃকাকে আবার প্রধান যোগিনীও বলা হয়। এই অষ্টমাতৃকা বা প্রধান আটজন যোগিনী থেকে পুনরায় সাতজন করে উৎপন্ন হয়ে মোট চৌষট্টিজন যোগিনী আবির্ভূর্তা হন এবং মা দুর্গাকে যুদ্ধে সাহায্য করেন।

সাধারণত মন্দির বলতে আমাদের মনে যে ছবি ভেসে ওঠে তার থেকে কিন্তু যে কোনো চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী সম্পূর্ণরূপে আলাদা ধরনের হয়। এই মন্দিরে না থাকে ছাদ, না থাকে গর্ভগৃহ। খোলা আকাশের নীচে একটি গোলাকৃতি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এক চত্বর যার ভিতরে প্রবেশ করার জন্য একটিই মাত্র দরজা। অবশ্য দরজার মাথায় ছোট্ট একটি ছাদের মতো আচ্ছাদন থাকে।

ভিতরে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ে চত্বরের কেন্দ্রে কোমর সমান উঁচু চতুষ্কোণী বেদীর উপর চারটি চারকোনা স্তম্ভযুক্ত চার খিলানের একটি ছোটো স্থাপত্য। এটিও ছাদবিহীন, তবে এটির উচ্চতা পাঁচিলের থেকে সামান্য বেশি। এই চারটি স্তম্ভের বাইরের দুদিকের গায়ে দুটি করে মোট আটটি প্রস্তরমূর্তি। এই আটটি মূর্তি অষ্টমাতৃকা বা প্রধান অষ্টযোগিনীদের। প্রবেশদ্বারের ভিতরে গোলাকৃতি পাঁচিলের গায়ে পরপর ছাপান্নজন যোগিদের প্রস্তরমূর্তি আর প্রবেশদ্বারের ঠিক উলটোদিকে অর্থাৎ আটাশতম ও উনতিরিশতম যোগিনীদ্বয়ের মাঝে মা দুর্গার প্রস্তরমূর্তি। যে সাতজন যোগিনী যে মাতৃকা বা প্রধান যোগিনী থেকে আবির্ভূতা, তাঁদের অবস্থান সেই সেই মাতৃকা বা প্রধান যোগিনীর বিপরীতে। মন্দিরে প্রবেশ করার পর একটি চক্রাকার গলিপথ ধরে মা দুর্গার কাছে পৌঁছতে হয়। অর্থাৎ পথের দুইপাশের একদিকে অষ্টমাতৃকারা আর অপরদিকে যোগিনীরা, মাঝে চলার পথ আর পথের শেষে মা দুর্গা। প্রাচীন রণকৌশলের নিদর্শন স্বরূপ এটি এক অদ্ভুত চক্রাকার রণব্যূহ যার মধ্যে প্রবেশ করলে শত্রুকে দুইদিক থেকে আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

এছাড়া আর একটি অবাক করা বিষয় হলো এই মন্দিরের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে সূর্যরশ্মির আলোছায়ার খেলা। আকাশে সূর্যের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যোগিনীদের উপর পতিত হওয়া সূর্যরশ্মিও যোগিনী পরিবর্তন করে। আবার উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নকালে মায়ের ডান ও বামদিকে থাকা যোগিনীদের উজ্জ্বলতার পরিমাণেও প্রভাব ফেলে। একই ঘটনা বহির্ভাগের নবদুর্গার ক্ষেত্রেও ঘটে। পাঁচিলের বাইরের দিকের দেওয়ালে মা দুর্গার ন'টি রূপের মূর্তি রয়েছে। পাঁচিলের ভিতরের দেওয়ালে যেখানে মা দুর্গার মূর্তিটি রয়েছে বাইরের দেওয়ালে ঠিক সেই জায়গায় একটি মূর্তি স্থাপন করে সমদূরত্ব বরাবর দুইদিকে চারটি করে মা দুর্গার মোট ন'টি রূপের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বিপরীতে মুক্ত আকাশের নীচে কোমর সমান উঁচু একটি বেশ বড়ো চাতাল। অতীতকালে অঘোর তান্ত্রিকদের সাধনস্থল ছিল এটি। মন্দির-চত্বরের বিপরীতে বিশাল জলাশয়ের মাঝে ডুবন্ত একটি মন্দির যার চূড়াটি শুধুমাত্র আজ জেগে রয়েছে। কে জানে সুদূর অতীতে

কোনো দেবতা বা দেবীর মন্দির ছিল এটি। উত্তর পাওয়ার আশায় এএসআই-এর বোর্ডের সামনে এসে হতাশ হতে হলো।

মায়ের পূজার বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয়। সামান্য উপাচারে মায়ের নিত্যসেবা চলে বছরভর। প্রথমে চৌষট্টি যোগিনীদের পায়ের কাছে ফুল নিবেদন এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয় তারপর মা দুর্গার পূজা শুরু হয়। মায়ের সামনে একটি অখণ্ড প্রদীপ জ্বলে। এটি যেন কোনোভাবে নিভে না যায় তার প্রতি নজর রাখাই মুখ্য বিধি। এখানে কেউ ইচ্ছে হলেই হঠাৎ করে চলে এসে পূজা দিতে পারে না। পূজা দিতে চাইলে আগে থেকে পুরোহিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যার নামে সংকল্প করে পূজা হবে তার জন্মতারিখ, জন্মসময়, জন্মস্থান ইত্যাদি বিষয় আগাম জানিয়ে দিনক্ষণ নির্ধারিত হলে তারপর এখানে এসে পূজা দিতে হয়। তবে এখানে মায়ের পূজা দেওয়ার বিষয়টি কিন্তু বেশ ব্যয়সাপেক্ষ।

এখানকার পূজা দেওয়ার বিশেষ নিয়ম যা সচারচর অন্য কোনোখানে দেখা যায় না। এরূপ নিয়ম-বিধি হওয়ার মূলে হয়তো জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে যা আজকের দিনে সম্পূর্ণরূপে বোঝা মুশকিল, এমনকী মন্দিরের পুরোহিতদের কাছেও এর সঠিক ব্যাখ্যা নেই বা বিশদে জানাতে চান না। তাঁরা বারবার বংশানুক্রমিক গুহ্য গণনা পদ্ধতির পরম্পরা অনুসরণের কথাই বলেন মাত্র।

তবে একান্তই ব্যক্তিগত ধারণা, আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র মতে রাশিচক্রে নক্ষত্রের সংখ্যা সাতাশটি ধরে বর্তমানে গণনা করা হলেও প্রাচীনকালে কিন্তু আটাশটি নক্ষত্র ধরেই গণনা করা হতো। বর্তমানে ব্রাত্য অভিজিৎ নামক নক্ষত্রটি কিন্তু প্রাচীনকালে সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ভাগ-নির্দেশ করছে কিনা এবং অষ্টমাতৃকারা অষ্টপ্রহরের নির্দেশক কিনা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। এই রকম ধারণা করার আর একটি কারণ হচ্ছে মা দুর্গার থেকেও উঁচু স্থানে অষ্টমাতৃকাদের অবস্থান যা সাধারণত হওয়া উচিত নয়। তাঁদের নিত্যপূজা না করে নিছক মূর্তি রূপে রাখা হলে বিষয়টি স্বাভাবিক হতো। এটা হতে পারে, তিথি বা নক্ষত্র গণনার নিমিত্তে সূর্যরশ্মির ছায়াকে বিশেষ তির্যক কোণে পতিত করার জন্য এইরকম স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়েছে। আবার এই স্থাপত্যকে যদি সূর্যঘড়ি হিসেবে ধরা যায় তবে ঘণ্টা-মিনিটের হিসেবেও স্থূলভাবে সময় মেলানো যায়। কারণ ৩৬০ ডিগ্রি ৬০ মিনিটের সমান। অর্থাৎ প্রতি মিনিট ছয় ডিগ্রির সমান। সুতরাং ৬ ডিগ্রি বা ৪ মিনিটকে চারজন যোগিনী রূপে কল্পনা করে নিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে প্রচলিত সূর্যঘড়ির মতো নিখুঁত সূক্ষ্মভাবে সময় মেলানো সম্ভব নয়।

সাঙ্গ হলো মন্দির দর্শন। এবার ফেরার পালা। ফেরার পথে মন্দির থেকে সামান্য পায়ে হাঁটা দূরত্বে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামীণ পুঁথি শিল্পীর বাড়ি। তালপাতাকে প্রথম নির্দিষ্ট মাপে কেটে তারপর সুতো দিয়ে গেঁথে এবং চারদিক কাপড় দিয়ে মুড়ে নিয়ে শুরু হয় এর উপর আঁকার কাজ। শিল্পীর তুলির টানে রামায়ণ, মহাভারত বা পৌরাণিক কাহিনির গল্প ফুটে ওঠে এক একটি পুঁথিতে। এই পুঁথি মুড়ে রাখাও যায় অথবা খুলে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখাও যায়, এমনই এর গঠনশৈলী। একটি পুঁথি সম্পূর্ণ হতে এক থেকে তিন মাস বা তারও বেশি সময় লেগে যায়, তাই এর মূল্যও অধিক। চার-পাঁচ হাজার টাকা থেকে শুরু হয়ে পঞ্চাশ হাজারও ছাড়িয়ে যায়। মন্দির দর্শনের সঙ্গে এই উপরি পাওনার ঝুলি নিয়ে উঠে এলাম গাড়িতে, গাড়ি ছুটল ভুবনেশ্বরের পানে। □

ফঃ৫

দেশের দাবি : এক দেশ, এক নির্বাচন

শিশির বল

'এক দেশ এক নির্বাচন' এই সহজ কথাটির অর্থ হলো সমগ্র ভারতের জন্য একটি মাত্র নির্বাচন। অর্থাৎ লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে হবে, যা নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে সরকার প্রতিপক্ষ ইন্ডিয়া জোট অবিরত বিতর্ক সৃষ্টি করে চলেছে। এক দেশ এক ভোট এই ধারণার প্রধান প্রবক্তা নরেন্দ্র মোদীজীর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রীরামনাথ কোবিন্দ এবং প্রণব মুখার্জি। তবে এই ধারণার শিকড় নিহিত রয়েছে ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭-তে ঘটে যাওয়া নির্বাচনগুলিতে। আশির দশকে প্রথমবার ১৯৮৩ সালে নির্বাচন কমিশন এই প্রস্তাব রেখেছিল। দ্বিতীয়বার ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর বিষয়টি আলোচনায় আসে। ২০১৬-তে প্রধানমন্ত্রী এই নীতির প্রস্তাব করার পর নীতি আয়োগ উদ্যোগী হয়। ২০১৭-তে নীতি আয়োগ জানায়, কীভাবে এই নীতি কার্যকর হবে, নরেন্দ্র মোদীজীর ক্যাবিনেট প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে অধ্যক্ষ করে একটি প্যানেল তৈরি করে ২০২৪-এ ১৪-১৫ মার্চে, সেই কমিটির সদস্য ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী, হরিশ সালভে, গোলাম নবি, আজাদ আরও অনেকে। ১৮ হাজার ৬২৬ পৃষ্ঠার রিপোর্ট পেশ করে প্যানেল এবং বলে এক দেশ এক ভোট এই ধারণা দেশে প্রবর্তন করা সম্ভব। ক্যাবিনেট তা গ্রহণ করে।

ভারতীয় গণতন্ত্রকে 'গণতন্ত্রের জননী' রূপে আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীতে ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি দেশের সংবিধান লাগু হয় এবং তারপর থেকেই আমাদের দেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারণা জাতীয় ও রাজ্যস্তরে অনুসরণ করে। ১৯৫১-তে লোকসভা ভোট এবং ১৯৫২-তে রাজ্য বিধানসভা ভোট ও রাজ্যসভার ভোট অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে লোকসভা-বিধানসভা ও রাজ্যসভার প্রতিনিধিরা মিলে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন। লোকসভা ও বিধানসভার কার্যকালের সময় বেঁধে দেওয়া হয় পাঁচ বছর, রাজ্যসভার জন্য ৬ বছর। ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪ নং অ্যামেন্ডমেন্ট অনুযায়ী পৌরসভা ও পঞ্চায়েত গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে এই প্যানেল এই লোকাল বডির নির্বাচনগুলিকেও লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ১০০ দিনের মধ্যে করার প্রস্তাব রাখেন।

এখন একটু আলোচনা করা যাক ভারতীয় সংসদ, সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারণা গ্রহণের পরবর্তীতে ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এক দেশ এক ভোটের যে ধারণা গ্রহণ করেছিল তা বাতিল হলো কেন? বাতিলের পেছনে কারণ কী ছিল এবং বর্তমানে কি এই ধারণার প্রয়োগ বাস্তবসম্মতভাবে সম্ভব?

১৯৬৭ সালের পর থেকে লোকসভা ভোট সময়মতো না হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল, জওহরলাল নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর পরে কংগ্রেস দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নেয় ইন্দিরা গান্ধী এবং কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নেয় মোরারজী দেশাই। দুই জনের মধ্যে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াইয়ে জয়ী হয় ইন্দিরা গান্ধী এবং তিনি ক্ষমতায় আসীন হন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কার্যকাল চলার কথা ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী মনে করেন সংসদে তার প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে লোকসভা ভেঙে ফেলার আবেদন জানান তাঁর দাবি মেনে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দেন এবং ১৯৭১ সালে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতা হাতে পান। এবার লোকসভার কার্যকাল হওয়ার কথা ১৯৭১ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কিন্তু ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেন।

ফলস্বরূপ তার ক্যাবিনেটের নেতারা ছাড়া তাঁর উপরে রুষ্ট হন এবং দেশের মানুষের মধ্যে এই গণতন্ত্র বিরোধী সিদ্ধান্তের কারণে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি ক্ষোভ তৈরি হয়। এবং ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হন এবং ক্ষমতা দখল করেন মোরারজী দেশাই। দু'বছরের মধ্যেই মোরারজী দেশাইয়ের সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় এবং সরকার ভেঙে যায়। ১৯৮০ সালে আবার লোকসভা নির্বাচন হয় এবং ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৮৪-তে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হন, তার বড়ো পুত্র রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় আসীন হয়ে রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা নির্বাচন করতে বলেন। নির্বাচন হলে রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে রাজীব গান্ধী নিহত হন। এরপর আসে ভিপি সিংহের সরকার, দু'বছরের বেশি তিনিও সরকার চালাতে পারেননি, ১৯৯১-এ আসে নরসীমা রাওয়ের নেতৃত্বে সরকার। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর এই সরকার তার কার্যকাল পূরণ করতে সক্ষম হয়। দেশের মানুষ দীর্ঘদিন কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলা সরকারের প্রতি আশাহত হয়ে পড়েছিল, দেশবাসী সঠিক রাজনীতির দিশা অনুপস্থিত থাকার কারণে ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনটে সরকারের বদল দেখতে হয়েছিল ভারতবাসীকে। দেশে ১৩ দিনের অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার, দেবেগৌড়াজীর সরকার, আই কে গুজরাল সরকার তৈরি হয়। এই কোয়ালিশন

> "নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে ২৮টি রাজ্য ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তারা একসঙ্গে ভোট করাতে পারবে। সুতরাং আর দেরি নয়।"

সরকারগুলি তাদের শরিকদের মানিয়ে চলবে নাকি জনগণের স্বার্থে প্রশাসন পরিচালনা করবে এই দোদুল্যমানতায় জনস্বার্থে নীতি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। দেশব্যাপী অচলাবস্থা দেখা দিলে পরিস্থিতির নিরিখে দেশের মানুষ স্থায়ী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং অটলজীর নেতৃত্বে ১৩ মাসের সরকার এবং ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত অটলজীর নেতৃত্বে পাঁচ বছরের সরকার গঠন করতে জনগণ মত দান করেন।

তাহলে দেখা গেল যে ১৯৬৭ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচন পাঁচ বছর পর পর হওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হলো কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা দখলের লড়াই, কংগ্রেস নেতৃত্বের গণতন্ত্র বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দীর্ঘদিন কংগ্রেসের শাসনে থাকা জনগণের হতাশা। যখন লোকসভা নির্বাচন সময়মতো হতে পারল না তখন রাজ্য বিধানসভার সঙ্গে তার সমতা নষ্ট হলো। এই সমতা ভেঙে যাওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ কংগ্রেসের সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক মতাদর্শ। রাজ্যগুলিতে তাদের অপছন্দের সরকার খারিজ করে দেওয়ার ভাবনা থেকেই রাজ্য বিধানসভায় সমস্যা তৈরি হয়। ১৯৫৯ সালে কেরালার সরকার ভেঙে দিতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে কেন্দ্র। সংবিধানের ৩৬৫নং ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় নির্দেশ রাজ্য সরকারগুলিকে মেনে চলতে হয়, না মেনে চললে ৩৫৬ নং ধারা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যায়। ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানাতে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে। ১৯৭৭ সালে মোরারজী দেশাই ৯টি রাজ্যে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে থাকা রাজ্য সরকারগুলিকে খারিজ করেন আবার ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে মোরারজি দেশায়ের পক্ষে থাকা ৯ রাজ্যের রাজ্য সরকারকে খারিজ করে দেন। অতএব রাজ্য বিধানসভা তার পাঁচ বছরের কার্যকাল কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের কারণে সম্পন্ন করতে পারেনি তার সঙ্গে ছিল horse trading। রাজনীতিতে একটা সময় এই কথাটি খুব প্রচলিত ছিল। আয়ারাম গয়ারাম অর্থাৎ ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার জন্য একদল থেকে ভোটে জিতে অন্য দলে ঝাঁপ দেওয়ার চল ছিল।

এই সমস্ত কারণে ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত যে এক দেশ এক ভোটের ধারণা ভারতে ছিল সেই ধারণা ভেঙে গেল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে সমস্ত কারণগুলির জন্য এই ধারণা বাতিল হলো সেই সমস্যাগুলোর সমাধান হয়েছে? উত্তর হলো, হ্যাঁ। সাধারণ মানুষ দেখল ১৯৯৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সমস্ত সরকারগুলি তাদের পাঁচ বছরের কার্যকাল সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে এর অন্যতম কারণ দলত্যাগ-বিরোধী আইন সংবিধানের ৫২তম সংশোধনী ১৯৮৫ অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো পার্টি থেকে মনোনীত হয়ে লোকসভায় আসেন এবং ব্যক্তিগত সুবিধার কারণে পার্টি পরিত্যাগ করেন তাহলে এই দলত্যাগ-বিরোধী আইন অনুযায়ী তার লোকসভা পদ খারিজ হয়ে যাবে, কিন্তু ওই দলের এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি যদি কোনে উপযুক্ত কারণে পার্টি পরিত্যাগ করতে চায় সেক্ষেত্রে তাদের লোকসভা পদ বাতিল হবে না।

পরবর্তীতে অটলবিহারী বাজপেয়ী দলত্যাগ-বিরোধী আইনে সংশোধনী আনেন এবং ঠিক হয় কোনো পার্টির দুই তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি যদি উপযুক্ত কারণে পার্টি পরিত্যাগ করে সেক্ষেত্রে তাদের লোকসভা পদ খারিজ হবে না। এই আইনের কারণে যখন তখন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকার ফেলে দেওয়া আটকানো গেছে। রাজ্য সরকারগুলিকে খারিজ করার অন্যতম হাতিয়ার ছিল ৩৫৬ নং ধারার প্রয়োগ। বর্তমানে এই ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাধ্যবাধকতা আছে। সর্বোপরি, এস আর বোম্মাই কেস হলো অন্যতম হাতিয়ার। এই মামালার রায় মোতাবেক রাজ্যপাল কীসের ভিত্তিতে ৩৫৬ নং ধারা প্রয়োগের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছেন এবং তা কতটা যথার্থ তা খতিয়ে দেখবে বিচারবিভাগ এবং রাষ্ট্রপতিকে বলা হয় তার কাছে যে প্রস্তাব রাজ্যপালের পক্ষ থেকে এসেছে সেই প্রস্তাব তিনি কতটা যথার্থভাবে বিবেচনা করেছেন তারও বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার উপায় রাখা হয়েছে। সুতরাং জুডিশিয়াল রিভিউয়ের কারণে সিদ্ধান্ত হেরফের করা প্রায় অসম্ভব। এত সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের ইন্ডিয়া জোট এক দেশ এক ভোটের বিরোধিতা করছে কেন? এর অন্যতম কারণ ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছে লোকসভা ভোটের নিরিখে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একসঙ্গে হলে আইএনডিআইএ জোট ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেমন দিল্লিতে আপ-কংগ্রেস একসঙ্গে লোকসভা নির্বাচন জোট করে লড়াই করে আবার বিধানসভা নির্বাচনে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে, অতএব লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একসঙ্গে হলে এই জোট ভেঙে পড়বে। বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তাই। ইন্ডিয়া জোট শরিকরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে এক দেশ এক ভোট চায় না।

এবার দেখা যাক ল' কমিশন রিপোর্টে কী উল্লেখ করেছে। ল' কমিশন বলছে একসঙ্গে ভোট হলে পাঁচ বছর ধরে ক্রমাগত ইলেকশন আবহ থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব হবে, অর্থের অপচয় বন্ধ হবে এবং সেই অর্থ জনস্বার্থে ব্যবহার করা যাবে। সরকারি নীতি কার্যকর করবার জন্য হাতে বেশি সময় পাওয়া যাবে। সরকারি স্কুলের শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, প্যারা মিলিটারি ক্রমাগত সারা বছর ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকে এই অবস্থা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা যাবে, গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব ভোটের প্রচারে সময় কম দিয়ে নিজের সরকারের কাজে বেশি মনোযোগ দিতে পারবেন। ভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মডেল কোড অব কন্ডাক্ট চালু হয়ে যায়। সেই সময় কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ঘোষণা বা তার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রেও উন্নয়নের কাজে গতি আসবে। পাঁচ বছরে একবার ভোট অর্থাৎ ভোটদানের প্রতি ভোটারদের আগ্রহ বাড়বে ফলে তারা অনেক চিন্তা ভাবনা করে ভোট দিতে পারবেন এবং ভোটদানের শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। পাঁচ বছরের মধ্যে ৩-৪ বার ভোট মানে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মোল্লাবাদী শক্তিগুলোই ভোটের সুযোগে সক্রিয় হয় একবারে ভোট মানে তাদের সক্রিয়তার সুযোগ কমবে। তাই এখনই উপযুক্ত সময় এক দেশ এক ভোট নীতি প্রবর্তন করার সরকারের কাছে ভোট পরিচালনা করবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান আছে। নির্বাচন কমিশনও একবারে ভোট করানোর সবুজ সংকেত দিয়েছেন। পর্যাপ্ত প্যারা মিলিটারি ফোর্স ভারত সরকারের কাছে আছে, প্রয়োজনীয় সংখ্যার ভিভিপ্যাট ও ভোটিং মেশিনের অভাব হবে না আশা করা যায়। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে ২৮টি রাজ্য ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তারা একসঙ্গে ভোট করাতে পারবে।

সুতরাং আর দেরি নয়, এখনই উপযুক্ত সময় নেপাল, সুইডেন, বেলজিয়াম, জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা পারলে আমরা পারবো না কেন? তাই জনগণের দাবি 'এক দেশ, এক নির্বাচন'। □

নাটক—‘১৬ আগস্ট দেন অ্যান্ড নাউ’ তুলে ধরে এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা

সব্যসাচী ব্যানার্জী

গত ২৯ এপ্রিল, দর্শক ভর্তি তপন থিয়েটারে হয়ে গেল এই সময়ের এক সাড়া জাগানো তথ্য নির্ভর বলিষ্ঠ প্রযোজনা এই ‘১৬ আগস্ট দেন অ্যান্ড নাউ’। এতো উপচে পড়া দর্শক সাম্প্রতিক নাটকগুলোতে খুব কম দেখা যায়। বহু বিশিষ্ট জন, সাধু-সন্তরা উপস্থিত ছিলেন, তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ‘পদ্মশ্রী’ প্রাপ্ত স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. জিষ্ণু বসু, ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ, নাট্যকার চঞ্চল ভট্টাচার্য আরও অনেকেই। নাটকের সংলাপ, দৃশ্য দেখে দর্শকদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নাট্যকার প্রবীর মণ্ডল এক জলজ্যান্ত বিষয় দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন।

নাটকের শুরুতেই দেখা যায় যে, মুর্শিদাবাদ-মোথাবাড়ি, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, কাশ্মীর হিন্দু শূন্য! মিউজিক এর সঙ্গে কথাগুলো শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল! জীবন্ত দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছিল! ফ্ল্যাশ ব্যাকে দাঙ্গাকারী, নিন্দু নিধনকারী, অত্যাচারী গোলাম সারোয়ার ও তার বাহিনীকে দেখা যায়। নির্মম কিছু দৃশ্য দেখা যায়। গোলাম একজন মুসলমানকে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতে বললে তার দলের এক সদস্য করুণ সুরে বলে ওঠে গোলাম ভাই একসময় আমরাও তো হিন্দু ছিলাম, এই দেশের ৯৯ শতাংশ মুসলমানদের পূর্বপুরুষ সনাতনী ছিল। কেন আমরা হিন্দুগো মারবো ভাই? নিরীহ হিন্দুরা তো মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করেনি। আমাগো রক্ত ও সনাতনী রক্ত। গোলাম তাকে দল থেকে বের করে দেয়! প্রথম পর্ব বীভৎস এক দাঙ্গার মাধ্যমে শেষ হয়।

দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় একজন নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দাবি করা ইউনানি চিকিৎসক হেকিম সাহেব আসেন মুসলমানদের সাচার কমিটি, ওবিসি মুসলমান, ওয়াকফের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে। তিনি স্বপ্ন দেখেন এই দেশে একদিন সবাই উর্দুতে কথা বলবে। মুসলমানরা একদিন এই দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। ইসলামে যাদের জন্ম হয়নি, তারা দুর্ভাগা! সবাইকে ইসলামিক দাওয়াত দিতে হবে। হেকিম সাহেবের এই সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে একজন সাধু মহারাজ হেকিম সাহেবের কাছে জানতে আসেন কেন এসব কথা বলে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছেন? হেকিম সাহেব যুক্তির জালে বন্দি করে মহারাজের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেন। হেকিম সাহেব বলেন— পৃথিবীতে তোমাগো হিন্দুদের সাংবিধানিক ভাবে কোনো দেশ নেই তার জন্য কি মুসলমানরা দায়ী? জাতপাতে বিভক্ত একটা ধর্ম, সেই মাজা ভাঙা জাতির কি কোনো নিজস্ব দেশ থাকতে পারে? এই কথায় মহারাজ কিছুক্ষণ নীরব থাকেন! মহারাজ বলেন আপনাদের মুসলমানদের দু-দুটো দেশ দেওয়ার পরে ও কেন এই ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হিন্দুরা উদ্বাস্তু হচ্ছে? কেন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে এখনো অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলো না? কেন এই ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে প্যান্ট খুলে তার ধর্ম পরিচয় হিন্দু জানার পর সেই মানুষকে খুন হতে হয়? হে ঈশ্বর আর কত প্রাণ বলিদান দিলে এই ভারতবর্ষ শান্ত হবে? এই জাতিকে তুমি চেতনা দাও, মুক্তি দাও।এই নাটক না দেখলে এর গুরুত্ব, মাহাত্ম্য শুধু লিখে ব্যাখ্যা বা অনুভব করা সম্ভব নয়। এই নাটক সারা ভারত জুড়ে হওয়া দরকার। নাটকের প্রশ্নগুলো নেতাদের কাছে পৌঁছানোটা আরও জরুরি। মধ্যে ৩০-৪৫ জন থিয়েটার আর্টিস্ট নিয়ে অভিনয় করানো একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। প্রবীর মণ্ডল সেই দুঃসাহসটা দেখিয়েছেন। এই সেই প্রবীর মণ্ডল, যার বিতর্কিত নাটক বাংলাদেশের অসহায় হিন্দুদের নিয়ে ‘হিন্দু চোর’ নাটকটি পুলিশ তিন তিনবার বন্ধ করে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। স্যালুট প্রবীরবাবু আপনাকে এবং আপনার পুরো টিমকে। দু’ একটা ত্রুটি বাদ দিলে প্রতিটি অভিনেতা অভিনয় করেছে একবারও মনে হয়নি। ড. অধ্যাপক অরিন্দম ভট্টাচার্য (বঙ্কিমবাবু) প্রাক্তন বামপন্থী শিক্ষকের ভূমিকায় যথাযথ, তাঁর প্রতিবাদী বোনের চরিত্রে অদিতি চক্রবর্তী ওরফে মিমি দাদাকে ছাপিয়ে গেছে।

কুরবান আলির (গণেশ) অ্যাটেম্পট টু রেপ ভয়ে দর্শক শিউরে ওঠে। রূপালীকে কাঁধে তুলে (অর্পণ) নিয়ে যাওয়া দর্শক বহুদিন মনে রাখবে। মুসলমান চাচা অশোক গুহ অল্প সময়ে দাগ কেটেছে! মহিলা চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলা অভিনেত্রীদের অসাধারণ বললে কম বলা হবে। এই নাটকের সম্পদ ঈষা নন্দী, শুক্লা বণিকদের অভিনয় দেখতে দেখতে দর্শক আসনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কাঁদতে কাঁদতে সবাই হাততালি দিচ্ছেন! নান্দীকারের কর্ণধার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রয়াত রামপ্রসাদ বণিকের ছাত্র এই প্রবীর মণ্ডলের কথা আর কী বলবো, বাংলা থিয়েটারে তাঁর এই প্রতিভাকে কেন বাকিরা ব্যবহার করছে না! তাঁর দ্বৈত ভূমিকায় অভিনীত গোলাম আর হাকিম সাহেব বাংলা থিয়েটারে একটা ইতিহাস তৈরি করলো! মহারাজের চরিত্রে ড. কৃষ্ণার্জুন মুখার্জি দর্শককে কাঁদালো সঙ্গে ভাবালো। প্রখ্যাত আলোক শিল্পী বাদল দাস মঞ্চে আলোর মায়াজাল তৈরি করলো। আবহ আরও কিছু দাবি করছে। সমীর ঘোষের মেক-আপ বিশ্বাসযোগ্য। অভিনয়ে ড. কৃষ্ণার্জুন মুখার্জি, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য্য, অ্যাডভোকেট প্রীতিদীপ্ত, শুক্লা, ঈষা, সোমা, অদিতি, তপন, শম্পা, গণেশ, অর্পণ, আদি, অরুণ, অশোক গুহ, তুষার, অমিত, সুব্রত, বিভাস, স্বরূপ, বাবুভাই ও অধ্যাপক ড. অরিন্দম ভট্টাচার্য্য। ব্যাকগ্রাউন্ডে চোখ ঢাকা ‘লেডি জাস্টিস’-এর কাছে প্রবীর মণ্ডল অনেক প্রশ্ন রেখে গেল। ‘টাকি সরস্বতী নাট্য কলা কেন্দ্র’ নিবেদিত, প্রবীর মণ্ডল রচিত, অভিনীত ও পরিচালিত এই ‘১৬ আগস্ট দেন অ্যান্ড নাউ’ নাটকটি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক। □

জ্যাভলিনে সোনার ছোঁয়া

অন্বেষা টুডুর সাফল্যের গল্প জনজাতি স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি

নিলয় সামান্ত

দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের বনশোল কদমী গ্রামের এক জনজাতি কন্যা আজ পশ্চিম বঙ্গের ক্রীড়াজগতে নতুন ইতিহাস লিখছেন। নাম তাঁর অন্বেষা টুডু— এক সংগ্রামী ঘরের মেয়ে, যিনি শুধু নিজের নয়, গোটা সমাজের গর্ব হয়ে উঠেছেন।

গত ২০-২৩ জুন কলকাতার সাই-এর মাঠে আয়োজিত ৭৩তম রাজ্যস্তর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছিল পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ আসর। এই প্রতিযোগিতার মহিলা সিনিয়র বিভাগের থ্রো-তে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে অংশ নেন অন্বেষা টুডু। ৩৭.৮৫ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুঁড়ে অন্বেষা প্রথম স্থান অর্জন করেন, জিতে নেন সোনার পদক।

এই সাফল্য নিছক কোনো ক্রীড়া জয়ের ঘটনা নয়। এর পেছনে আছে অভাবের সঙ্গে প্রতিদিনের যুদ্ধ, অধ্যবসায় আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির গল্প। অন্বেষার বাবা রূপলাল টুডু, পেশায় দিনমজুর। কোনোভাবে সংসার চলে। তিনবেলা খাবার জোটাতে যেখানে লড়াই, সেখানে জ্যাভলিন কেনা তো বিলাসিতা। তবুও হাল না ছেড়ে অন্বেষা নিজের পথ তৈরি করেছেন।

দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে অন্বেষা স্নাতক হয়েছেন। ক্রীড়ার প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য তিনি আশ্রয় নেন বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট মাস্টার্স অ্যাথেলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের। পার্শ্ববর্তী ইছাপুর গ্রামের একটি সাধারণ মাঠেই চলে তাঁর অনুশীলন। এর আগেও তিনি ভুবনেশ্বরে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের জ্যাভলিন প্রতিযোগিতাতে অংশ নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

দীর্ঘ ২১ বছর পরে এই প্রথম দুর্গাপুর থেকে কোনো প্রতিযোগী মহিলা জ্যাভলিন বিভাগে রাজ্যস্তরে সোনার পদক জিতলেন— যা এই শহর এবং জেলার কাছে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এই অর্জন শুধুই ব্যক্তিগত নয়, তা যেন গোটা জনজাতি সমাজের সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল।

জ্যাভলিন থ্রো খেলা হয় সিন্থেটিক ট্র্যাকে, যেখানে প্রয়োজন উন্নতমানের জুতো, আর একাধিক জ্যাভলিন স্পিয়ার। একটি জ্যাভলিন ছুঁড়ে বারবার তা তুলে আনতে হলে অনুশীলনে ঘাটতি পড়ে। কিন্তু অন্বেষার পরিবারের পক্ষে চার-পাঁচটি জ্যাভলিন কেনা বা উন্নতমানের জুতো কেনা সম্ভব নয়। একটি ভালো জ্যাভলিনের দাম ১১-১২ হাজার টাকা, আর স্পোর্টস শুর দাম প্রায় ১৪-১৫ হাজার টাকা— যা এই দরিদ্র পরিবারে একপ্রকার স্বপ্নের মতো।

অন্বেষা নিজে বলেন, 'আমাদের মতো গরিব পরিবারে উন্নতমানের জ্যাভলিন বা খেলার জুতো কেনা অসম্ভব। তবুও আমি জাতীয় স্তরে খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও অংশ নিতে চাই। যদি সরকারি সহায়তা পাই, তাহলে আরও ভালো কিছু করা সম্ভব হবে।'

অন্বেষার প্রশিক্ষক দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই মেয়ের মধ্যে প্রতিভার কোনো অভাব নেই। কিন্তু এমন বহু প্রতিভাবান ছেলে-মেয়ে আর্থিক অনটনের কারণে থেমে যাচ্ছে। সরকারি সাহায্য ছাড়া এদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। অন্বেষার মতো খেলোয়াড়রা সুযোগ পেলে সারা দেশকে গর্বিত করতে পারবে।' অন্বেষা টুডুর এই সাফল্য শুধুমাত্র একদিনের হেডলাইন নয়। এটি একটি চলমান যাত্রার সূচনা— যেখানে প্রতিভা, পরিশ্রম এবং স্বপ্ন মিলেমিশে তৈরি হচ্ছে এক নতুন ভবিষ্যৎ। সরকারের উচিত এই ধরনের প্রতিভাকে সময়মতো অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা, যাতে তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারে। অন্বেষার হাতে থাকা সেই জ্যাভলিন এখন শুধু একটি খেলার সরঞ্জাম নয়— তা হবে উঠেছে হাজারো অন্বেষার স্বপ্ন পূরণের অস্ত্র। □

অহংকারের ফল

বোধিসত্ত্ব একবার চড়াইপাখি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সকাল থেকে বিকাল খাবারের সন্ধান করে বেড়াত সেই পাখি। বিভিন্ন জমিতে গিয়ে শস্যদানা সেই চড়াই খুঁটে খুঁটে খেত। সন্ধ্যা নামলেই সে আবার তার বাসায় ফিরে আসত।

চাষিরা জমির ফসল কেটে নিলে খুব কষ্টে থাকতে হতো চড়াইকে। তখন তাকে গভীর জঙ্গলে খাবারের সন্ধানে যেতে হতো। জঙ্গলে তো শস্যদানা পাওয়া যায় না।

সেবার চাষিরা তোদের খেত থেকে শস্য তুলে নিয়েছে। স্বভাবতই চড়াই এক গভীর জঙ্গলে গেল খাবার খুঁজতে। সেই জঙ্গলে একটি বিশাল গাছে এক ঈগল বাস করত। চড়াইকে দেখে শিকারি ঈগলের চোখ লোভে চকচক করতে লাগল। তারপরই গাছের মগডাল থেকে ছোঁ মেরে চড়াইকে মাটি থেকে তুলে নিল।

অসহায় চড়াই তখন কান্নার স্বরে নিজে নিজে বলতে লাগল, কী যে ভুল করলাম। জঙ্গলে এসে আমার মহাবিপদ হলো দেখছি। নিজের জায়গায় থাকলে এই বড়ো ঈগলের ক্ষমতা হতো না আমাকে ধরার। জঙ্গল বলে আমি এই ঈগলের সঙ্গে পারছি না। আমার নিজের জায়গায় থাকলে এই বড়ো ঈগল আমার সঙ্গে লড়াইয়ে কিছুতেই পারত না।

একটা ছোটো চড়াইয়ের মুখে এই কথা শুনে ঈগল খুব রেগে গেল। চিৎকার করে ঈগল বলল, ওরে ছোটো চড়াই, তোর তো সাহস কম নয়। তুই আমাকে অপনাম করছিস। দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি। চল, তো নিজের জায়গায়, দেখি তোর কত শক্তি, আর তুই কীভাবে আমার হাত থেকে বাঁচিস।

চড়াই তখন বলল, চলুন আমার জায়গা হলো জঙ্গলের বাইরে চাষিদের খেত। ঈগল চড়াইকে জঙ্গলের বাইরে চাষিদের খেতে নিয়ে এল।

চাষিরা তখন নতুন বছরের ফসলের জন্য জমিতে লাঙ্গল চালিয়েছিল। খেতের মাটি উঁচু-নীচু হয়ে ছিল। সেই খেতের মাঝখানে এক খণ্ড পাথর বহুদিন থেকে পড়ে ছিল। ঈগল চড়াইকে সেই পাথরের খণ্ডের উপর ছেড়ে দিয়ে আকাশে উঠে গেল। চড়াই পাথরের খণ্ডের উপর বসে ঈগলকে বলল, এসো আমার সঙ্গে লড়াই করো। আজ পরীক্ষা হয়ে যাক কার শক্তি বেশি।

একথা শুনে ঈগল ঝড়ের বেগে নেমে এল চড়াইকে মারতে। সঙ্গে সঙ্গে চড়াই সেই পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। ঈগল তার গতি সামলাতে না পেরে পাথরের উপর আছড়ে পড়ল। একটু পরে রক্তাক্ত অবস্থায় নীচে গড়িয়ে পড়ল। ততক্ষণে তার জীবনদীপ নিভে গেছে।

ছোটো বন্ধুরা, জেনে রাখো, অহংকারের ফল এভাবেই হাতেনাতে পাওয়া যায়।

(সংগৃহীত)

জাতীয় উদ্যান

নন্দাদেবী

নন্দাদেবী জাতীয় উদ্যান উত্তর ভারতের উত্তরাখণ্ডের চামোলি গাড়োয়াল জেলায় নন্দাদেবী পর্বতচূড়ার চারপাশে অবস্থিত। ১৯৮২ সালে এটি জাতীয় উদ্যান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯২ সালে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করে। উদ্যানটি ৬৩০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই উদ্যানে যেমন বিভিন্ন রকমের গাছগাছালি রয়েছে, তেমনই বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুও রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে এশিয়াটিক কালো ভল্লুক, তুষার চিতা, বাদামি ভল্লুক, নীল ভেড়া। রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। এই উদ্যানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এক পুষ্প উপত্যকা। এই উদ্যানের প্রবেশ দ্বার হলো যোশীমঠ।

এসো সংস্কৃত শিখি-৭৪

संख्यापाठः

४१-४१ एकचत्वारिंशत्। ४२-४२ द्वाचत्वारिंशत्।
४३-४३ त्रिचत्वारिंशत्। ४४- ४४ चतुश्चत्वारिंशत्।
४५- ४५ पञ्चाचत्वरिंशत्। ४६-४६ षट्चत्वारिंशत्।
४७-४७ सप्तचत्वारिंशत्। ४८- ४८ अष्टचत्वारिंशत्।
४९-४९नवचत्वारिंशत्। ५०-५० पञ्चाशत्।
५१-५१एकपञ्चाशत्। ५२-५२द्विपञ्चाशत्।
५३-५३ त्रिपञ्चाशत्।५४- ५४चतु:पञ्चाशत्।
५५-५५ पञ्चपञ्चाशत्। ५६-५६ ाट्पञ्चाशत्।
५७-५७सप्तपञ्चाशत्। ५८-५८अष्टपञ्चाशत्।
५९-५९ नवपञ्चाशत्। ६०-६०षष्टिः।

ভালো কথা

পরভৃত

আমাদের কাঁঠাল গাছটাতে প্রতি বছর দুটো শালিক বাসা বাঁধে। প্রতি বছরই চার-পাঁচটি ছানা হয়। ওরা বড়ো হয়ে উড়ে চলে যায়। আর ওদের দেখা যায় না। এবারও শালিখ দুটো বাসা বেঁধেছে। কিন্তু একটা ছানা হয়েছে, তাও আবার কোকিল ছানা। শালিক দুটো কোকিল ছানাটাকেই খাইয়ে বড়ো করছে। আমি দাদুকে জিজ্ঞেস করলাম, কোকিল তো কাকের বাসায় ডিম পাড়ে? দাদু বললেন, সাধারণত কোকিল কাকের বাসায়ই ডিম পাড়ে। কিন্তু কখনো কখনো অন্য পাখির বাসায়ও ডিম পাড়ে। কোকিলের ছানা অন্য পাখির দ্বারা প্রতিপালিত হয়। তাই কোকিলকে পরভৃত বলা হয়।

বিদিশা সরদার, একাদশ শ্রেণী, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

স্বর্গে কথপোকথন

নীলাক্ষ পাণিগ্রাহী, পঞ্চমশ্রেণী, ইবি, মালদা।

হে মা পার্বতী, দাদা যায় মর্ত্যে,
কী কারণ সেখানে।
আমি কি যাব মোদক যেখানে?
পার্বতী কহে, যেয়ো না পুত্র,
কারণ দাদার কদর সেখানে।

শুনিয়া গণেশ রেগে অস্থির,
দাদার সাথে বিবাদ সুনিশ্চিত।
দাদা কহে, যাবি যাবি,
ভাই মোর যাবি,
পূজা শেষে নাচি নাচি,দুই ভাই নাচি।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

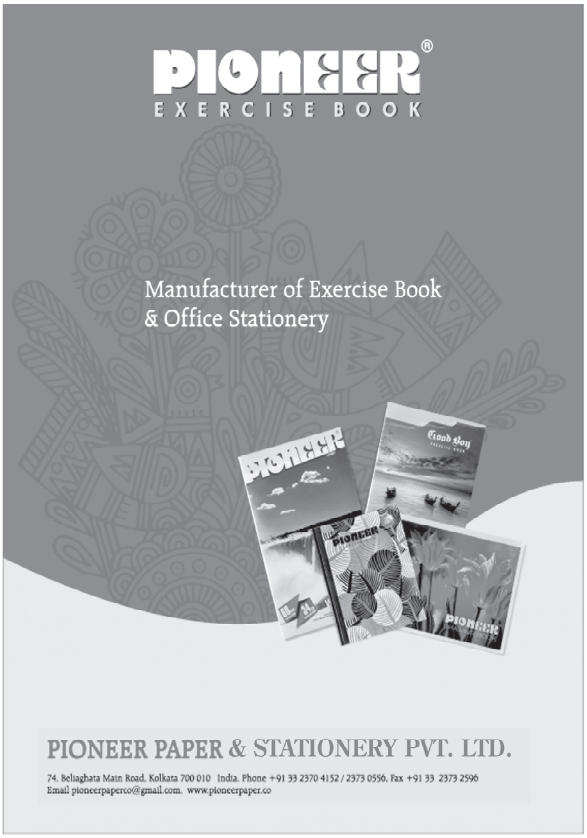

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

একটা ভয়ংকর অপ্রিয় সত্য

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে অ-ইসলাম বনাম ইসলামের মধ্যে

বরুণ মণ্ডল

মনে পড়ে ২২ বছরের সেই কুর্দিশ তরুণী মাহসা আমিনিকে? হিজাবের ফাঁক দিয়ে দু'গাছা মাথার চুল দেখা গিয়েছিল বলে আয়াতুল্লাহ খোমেনির 'নীতি পুলিশ' মাথায় পাথর ছুঁড়ে, পিটিয়ে হত্যা করেছিল। যারা ইরান সম্পর্কে খবর রাখেন না বা ইজরায়েল, আমেরিকা কেন ইরানের প্রতি বিদ্বেষী কিংবা যারা 'যত মত তত পথ'-কে মান্যতা দেন; যারা ভাবেন আন্তর্জাতিক রাজনীতি মানেই আমেরিকার দাদাগিরি ইত্যাদি, তাদের জন্য আজকের এই আলোচনাটি।

ইসলামি শরিয়তি সংবিধান দ্বারা পরিচালিত শিয়া মুসলমানদের দেশ ইরান। ভয়ংকর সব অমানবিক মধ্যযুগীয় আইনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে দেশটিকে। নিজেদের দেশের জনগণ এবং নারী সমাজকে মধ্যযুগীয় আইন দ্বারা নিষ্পেষিত করে চলেছে। পুরুষের বহু স্ত্রী রাখা সরকারিভাবে বহাল সেখানে। বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে শরিয়তি তিন তালাক প্রথার সরকারি স্বীকৃতি রয়েছে। হিজাব, বোরখা প্রথা ভয়ংকরভাবে প্রচলিত। মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও সুন্নি মুসলমানদের প্রতি তীব্র ঘৃণা বিদ্বেষ রয়েছে।

ইরান যা অতীতের পারস্য দেশটিকে জবর দখল করেছিল আজকের ইরানি মুসলমানরা। সেখানকার ভূমিপুত্র অর্থাৎ পারসিরা তাদের অত্যাচারে স্বভূমি থেকে অধিকাংশ পলায়ন করে। ভারতের হিন্দু রাজারা সেই পারস্য দেশের শিকদের আশ্রয় দিয়েছিল। শুধু আশ্রয় নয়, ভারতের হিন্দুত্ব তথা বহুত্ববাদী সংস্কৃতিতে পারসিরা নিজেদের সংস্কৃতি ধর্ম রক্ষা করেছে। আর যে সমস্ত পারসি স্বদেশ তথা পারস্যে থেকে গেছিল, তারা ইসলামিক আগ্রাসনের কাছে মাথানত করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ফলে পারস্যে আজ এক শতাংশও পারসি নেই।

স্বভূমি অর্থাৎ পারস্যে ইসলামি দেশে যে সমস্ত পারসি ধর্মান্তরিত হয়ে থাকলেন তারা বিশ্বে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। একসময় যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ালেন তারা একদিন থিতু হলেন, ইজরায়েল গঠন করলেন। সেখানে তাদের ভাষা-সংস্কৃতি- ধর্ম-কৃষ্টি নতুনভাবে উত্থান ঘটালেন। যে সমস্ত পারসি ভারতে আশ্রয় নিলেন তারাও নিজেদের ধর্ম, ভাষা সংস্কৃতি বজায় রেখেও ভারতের উন্নয়নে সহযোগী হয়ে উঠলেন। রতন টাটা, হোমিও ভাবা, ভিকাজি কামা, জামশেদজী টাটা, সাইরাস পুনেওয়ালা, সাইরাস মিস্ত্রি, অরুণা ইরানি, বোমান ইরানি এমন অনেকেই ভারতের সুসন্তান হয়ে জীবন কাটিয়েছেন ও কাটাচ্ছেন। আর যারা সেদিন পালিয়ে আসতে না পেরে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়ে নিজের দেশে থেকে গেছিলেন তাদের মেধার কতটা বিকশিত হয়েছে?

পারস্য তথা ইরান সত্যিই মেধাবী জনগণের বিরাট এক দেশ। এত তৈলসম্পদ, হরমুজ প্রণালী থাকা সত্ত্বেও উন্নয়ন নেই। সমগ্র বিশ্বের প্রতি সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। শুধু একের পর এক অত্যাচারী শাসক দিয়ে গেছে। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে। মজহবি ধোঁয়ায় মস্তিষ্ক ধোঁয়াশা করে দিয়ে সেই অন্ধকারকে আল্লার বরদান ভাবিয়েছে। ঠিক যেমন আফগানিস্তান, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের পরিস্থিতি হয়েছে।

ইসলামি নীতির অন্যতম প্রধান অংশ হলো আল্লাকে যে মানে না সে কাফের। আর কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করাই একমাত্র পন্থা। ইসলামে বিশ্বাসী ছাড়া ইহুদি-খ্রিস্টান, জৈন-হিন্দু ইত্যাদি সমস্ত ধর্মের মানুষ কাফের এবং ইসলামের চোখে কোতলযোগ্য। কাফেরদের হটিয়ে সমগ্র বিশ্বে

আল্লার শাসন তথা ইসলামি শরিয়তি শাসন প্রতিষ্ঠা করা ইসলামি জেহাদিদের একমাত্র স্বপ্ন। এমন একটা মানসিকতা লালনপালন করা দেশের হাতে বিধ্বংসী পরমাণু বোমা যদি থাকে, তবে পৃথিবীর অস্তিত্ব কোথায় দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। পরমাণু অস্ত্রে বলিয়ান ইরান তাই আজ বিশ্বের মানুষের কাছে বিভীষিকা।

পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে ইরান স্বাক্ষর করেনি। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ বিষয়কে সমাবেশে ইরানকে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছিল কিন্তু সেখানেও তারা হাজির হতে চায়নি। দীর্ঘদিন ধরে ইরানের সঙ্গে ছোট্ট একটি দেশ ইজরায়েল লড়াই করে চলেছে। ইরানিদের আগ্রাসনে ইজরাইয়েল তাদের ভূমি থেকে উৎখাত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিজেদের সদিচ্ছার জোরে ইজরায়েল ছোট্ট একটি উন্নত মানের দেশ গঠন করেছে। সুতরাং ইজরায়েলিদের এই লড়াই নিজেদের ভূমি পুনর্দখল এবং নিজেদের ধর্ম ভাষা সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। ইসলামিক মজহব অমুসলমানদের কাছে কতটা ভয়ংকর, ভূমি থেকে উৎখাত হওয়া ইহুদিরা জেনেছে। সে কারণে ইসলামি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইকে ইজরায়েল সবসময় সমর্থন করে এসেছে।

ইরান এমন একটা জাতিসঙ্ঘ স্বীকৃত দেশ তাদের সংবিধান, তাদের শাসনব্যবস্থা এবং বিশ্বের ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের স্বপ্নগুলো একই। অর্থাৎ বিশ্বের ইসলামিক সন্ত্রাসীদের রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্বীকৃত 'হেড অফিস' হলো ইরান। তাই ইরানের উপর হামলা শুরু হওয়া মাত্রই ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলি ডাক দিয়েছে বিশ্বের ৫৭টি ইসলামিক দেশগুলোকে ইরানের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। তাদের এই ডাক প্রমাণ করে অমুসলমানদের বিরুদ্ধে ইসলাম ভিতরে ভিতরে এক জোট হয়ে আছে। এখন জোটবদ্ধভাবে সরাসরি লড়াই করতে চাইছে। এমনিতেই আয়াতুল্লা খোমেইনিকে মুসলমান সমাজ নবির উত্তরসূরি ভাবে। হামাস ও হুথি জঙ্গিগোষ্ঠীকে তারা সরাসরি সমর্থন করে। যে ইরান পারস্য দেশকে জবরদখল করে বসে আছে, সেদেশের জনজাতিদের স্বভূমি ছাড়া করেছে, তাদের ধর্ম সংস্কৃতিকে আগ্রাসন করেছে। সমগ্র বিশ্ব দখল করার জন্য 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন' পথ অবলম্বন করে চলেছে। তাহলে তাদের হাত থেকে বাঁচতে বাকি জাতিগুলি ঐক্যবদ্ধ হবে না কেন?

স্পষ্টতই ইসলাম একটা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দল। জঙ্গি সংগঠন, মজববি সংগঠন এবং রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে সেই দলটি ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বকে ঘিরে ধরছে। সমগ্র বিশ্বে যেখানেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায় সেখানেই শরিয়তি আইন দাবি করে বসে।

অন্যদিকে তথাকথিত অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ এলাকায় মানুষের তাৎক্ষণিক সুযোগসুবিধার দাবি আদায়ের জন্য লড়ছে। তাৎক্ষণিক সুযোগসুবিধার জন্য ক্ষমতা দখলের লড়াই করছে। কিন্তু মুসলমানরা লড়ছে সমগ্র বিশ্বকে দার-উল-ইসলাম করার জন্য। স্থানীয় কোনো দুর্নীতি বা সুযোগসুবিধা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। ইসলামি বিশ্ব বানাবার জন্য যে রাজনৈতিক দল বা সংগঠন সক্রিয় তাদের তারা সমর্থন করে চলেছে। তাদের মতাদর্শকে মেনে চলতে গিয়ে আফগানিস্তান আজ বিধ্বস্ত, পাকিস্তান আজ বিধ্বস্ত, বাংলাদেশ আজ বিধ্বস্ত। সেই সমস্ত দেশের সাধারণ নাগরিকের জীবনযাত্রার মান ভীষণ অনুন্নত। সেসব নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের ক্লান্তি নেই।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সরকার আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে অথচ সেগুলো তাদের চোখে পড়ে না। তারা ইসলামি জেহাদি বৃক্ষের শিকড়ে জল ঢালছে মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্ত ভোট তৃণমূলের ঝুলিতে আনার জন্য। সাম্প্রতিক কালিগঞ্জ উপনির্বাচনের ফলাফল তা স্পষ্ট হয়েছে। ৩৪ বছর ধরে বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গকে শাসনের নামে শোষণ করেছে। মুসলমানদের তারা কোনো উন্নয়ন করেনি তবু মুসলমানদের সমর্থন তাদের পক্ষেই ছিল। পড়শি দেশ বাংলাদেশের তদারকি সরকার প্রধান মহম্মদ ইউনুস রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়ে সে দেশের করণ দশা করে ছেড়েছেন, তথাপি তাদের সমর্থন ইউনুসকেই।

বিশ্লেষণ চলছে, আমেরিকার ইরানের উপর আক্রমণ নাকি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সঠিক তথ্য তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটতে বিলম্বিত করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। সারা বিশ্ব না চাইলেও বিশ্বের ৫৭টি ইসলামি দেশ ধীরে ধীরে একত্রিত হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে কাফেরদের হটিয়ে সমগ্র বিশ্ব দখল করার জন্য। আধুনিক মানুষেরা বলেন সম্প্রদায় কোনো বিষয় নয়। অথচ ইতিমধ্যে ৫৭টি দেশ মজহবের ভিত্তিতে একত্রিত হওয়ার পথ অনেকটা এগিয়ে গেছে। তারা তীব্রভাবে বিধর্মীদের ঘৃণা করে। সুতরাং পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধ হবে ইসলাম বনাম অ-ইসলামের মধ্যে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইসলামের শক্তিকে শক্তিহীন করার জন্য লড়াই করছেন, এটা নিছক আমেরিকার ক্ষমতা প্রদর্শন নয়। সম্ভবত দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে ট্রাম্প ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝে গেছেন। তাঁর মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোতেই প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমেরিকা ও ইজরায়েল ইরানকে থামাতে না পারলেও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে। আর থামাতে পারলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিলম্বিত হবে এবং অ-মুসলমানরা একত্রিত হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা নেই।

আগামী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই তাত্ত্বিক দিকটা অনুধাবন না করতে পারলে রাশিয়ার পুতিনকেও পস্তাতে হতে পারে। কারণ পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধটা ইসলামের কারণেই হবে। ভৌগোলিক সম্পদ দখলের লড়াই নয়। রাশিয়া ও ইজরায়েল দুই দেশের ভারতের বন্ধু দেশ। ইজরায়েল অতীতে ঘা খেয়ে ইরান এবং ইসলামিক ব্রাদারহুডদের মতাদর্শ বুঝে গেছে। ভারতের উচিত রাশিয়াকেও সেটা জলের মতো পরিষ্কার করে দেওয়া। আগামী যুদ্ধে বহুল প্রচলিত 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু' নীতি কার্যকর হবে বলে মনে হয় না। ইসলাম কবুল না করলে সে কাফের, আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে কাফের ও ইসলামের মধ্যে। এটা একটা ভয়ংকর অপ্রিয় সত্য। □

প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের প্রত্যাঘাতে অসহায় দর্শকের ভূমিকায় সব ইসলামি দেশ

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

প্যালেস্তাইন ভূখণ্ড মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এই মাটি জন্ম দিয়েছে ফাতাহ, পিএলও, হামাস, কুর্তির মতো ভয়ংকর সব সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের। এই মাটিরই ফসল বিশ্বের বৃহৎ তিনটি রিলিজিয়ন ইহুদি, খ্রিস্ট ও ইসলামের। কখনো সরাসরি সরকারি মদতে, কখনো মজহবি সংগঠনগুলির আর্থিক সহায়তায় সন্ত্রাসবাদীরা হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। যেমন আজও বিশ্বের একটা অংশ মনে করে হামাসের গড়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রয়েছে আমেরিকার। হামাসের সেই সন্ত্রাসকে ধ্বংস করার জন্য প্যালেস্তানীয়দের উপর ইজরায়েলের ক্রমাগত আক্রমণ ঠিক না ভুল, তা অবশ্যই বিচার্য বিষয়। তবে ইজরায়েলের ভয়ংকর প্রত্যাঘাতে গাজা ভূখণ্ডের ওইটুকু অংশ লক্ষ শিশু-নারীর গণকবরে পরিণত হওয়া দৃশ্য সত্যিই বিশ্ব মানবতাকে শিহরিত করে, কাতর করে। জাগ্রত বিবেক চিৎকার করে প্রশ্ন তোলে এই মৃত্যু, এই ধ্বংস? এই আকাশফাটা হাহাকারের দায় কার? এর শেষ কোথায়?

তার চেয়েও বড়ো প্রশ্ন হলো বাকি বিশ্ব কী করছে! অন্তত একটিও কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে বিশ্বের কোনো একটি দেশ? ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে পশ্চিমি দুনিয়ার কোনো দেশ কোনো পদক্ষেপ করবে না, এটা বাস্তবতা। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান প্রধান দেশগুলোর ভূমিকা কী? মিডিয়ার সামনে এবং সরকারি নথিতে এই যে এত হম্বিতম্বি, হুংকার, 'দেখে নেব' মনোভাবের সত্যিই কি কোনো বাস্তবতা আছে, নাকি সবটাই ফাঁকা আওয়াজ? অন্ততপক্ষে এখনো পর্যন্ত একটিও কোনো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেনি কোনো দেশ। বরং প্রকৃত বাস্তবতা এই, ইসলামি কোনো দেশের সরাসরি ইজরায়েলের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার ক্ষমতাই নেই। নেই বাণিজ্য, অর্থনৈতিক, পররাষ্ট্র নির্ভরতা উপেক্ষা করে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপের সামান্যতম সদিচ্ছা। অ্যাপেল, ফেসবুক, টুইটার-সহ সবকটা সামাজিক প্রচার মাধ্যমের নিয়ন্ত্রক ইজরায়েল। প্রযুক্তি বিষয়ে বিশেষ করে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে বিশ্বের সেরা ইজরায়েল। আমেরিকা-সহ পশ্চিমি দুনিয়ার সব উন্নত দেশের ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ ইজরায়েলের হাতেই। জ্ঞানে, মেধায়, পরিশ্রমে, দূরদৃষ্টিতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি তারা। তাদের আছে অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করার পরও জাতির উঠে দাঁড়ানো উজ্জ্বল ইতিহাস।

ভারতবর্ষের মাটিতে প্যালেস্তানি পতাকা ওড়ানোটা প্যালেস্তানীয়দের প্রতি মানবিক হওয়ার লক্ষণ নয়, বরং এটা উগ্র ইসলাম আনুগত্য, গণতান্ত্রিক ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতি মোল্লাবাদীদের চ্যালেঞ্জ।

আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা যে কেউই জানেন আজকের দিনে একটিও কোনো ইসলামি দেশ প্যালেস্তানীয়-দের আশ্রয় দিতে রাজি নয়। ১৯৪৮ সালের 'নাকবা' যুদ্ধে প্রায় সাত লক্ষ এবং পরবর্তীকালে ১৯৬৭ সালের ইতিহাস বিখ্যাত 'ছয় দিনের যুদ্ধ'-এ যে তিন লক্ষ প্যালেস্তানীয় বাস্তুচ্যুত হয়েছিল, তারাই পার্শ্ববর্তী মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর প্যালেস্তানীয়

জনসংখ্যা। জর্ডনে এই জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি, প্রায় বত্রিশ লক্ষ। সিরিয়া ছয় লক্ষ, লেবানন চার লক্ষ, সৌদি আরব তিন লক্ষ, মিশরে আড়াই লক্ষ প্রায়। মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে প্যালেস্তানীয়দের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি চিলিতে, প্রায় পাঁচ লক্ষ। সাম্প্রতিককালে ইজরায়েলের আক্রমণের পরে সেই প্যালেস্তানীয়দের আশ্রয় দানে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বেশিরভাগ ইসলামি দেশ। হামাস নামের যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটি প্রকৃত অর্থে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্যালেস্তাইনের পক্ষে লড়াই করছে, সেই সংগঠন কিংবা তাদের শাখাগুলিকে নিষিদ্ধ করেছে দেশগুলি। বরং ইতিহাস এ-কথা স্পষ্ট করে লিখে রেখেছে, ইসলামি দেশগুলি বিভিন্ন সময়ে নিজেদের প্রয়োজনে প্যালেস্তানীয়দের হত্যা করেছে এবং বিতাড়িত করেছে। ১৯৭০ সালে জর্ডন ২৫ হাজার প্যালেস্তানীয়কে হত্যা করে, দেশ থেকে বিতাড়িত করে কয়েক লক্ষ। তখন সরাসরি সমর্থন জুগিয়েছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জিয়াউল হক। লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি গদ্দাফি প্যালেস্তানীয়দের তাড়িয়ে ছিলেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে বিতাড়িত হয়েছিলেন কয়েক লক্ষ প্যালেস্তানীয়। ১৯৯০ সালে ইরাক আরেকটি ইসলামি দেশ কুয়েত আক্রমণ করার পর, দেশটি মার্কিনদের সাহায্য নিয়ে ১৯৯১ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতে যায়। তারপরেই কুয়েত দেশ থেকে তিন লক্ষ প্যালেস্তানীয় পালিয়ে যায়।

সাম্প্রতিক গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাংকে ভয়াবহ যুদ্ধের সূত্রপাত ২০২৩ সালে ৭ আগস্ট ইজরায়েলের ওপর হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীর আক্রমণের পর। এটি শতাব্দীর অন্যতম বড়ো যুদ্ধ। ঘটনায় প্রথমে বারো'শো ইজরায়েলি হত্যা হয় হামাস জঙ্গি সংগঠনের হাতে। ইজরায়েলি সেনার পালটা আক্রমণে এখনো পর্যন্ত মারা গেছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার প্যালেস্তানীয় সাধারণ নাগরিক। দিন যত এগিয়েছে আক্রমণের তীব্রতা তত বেড়েছে। প্যালেস্তানীয়রা পালাতে পালাতে গাজা ভূখণ্ডের একেবারে এক প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। যার একদিকে মিশর-জর্ডন, অপরদিকে সমুদ্র ও ইজরায়েল। এই মুহূর্তে প্রায় দশ লক্ষ প্যালেস্তানীয় ছোট্ট একটি শহর রাফাতে অবস্থান করছে। নির্বিচারে সেখানেও চলেছে আক্রমণ। পরিস্থিতি বুঝে ইসলামি দেশ মিশর ও জর্ডন তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। ঘোষণা করেছে একজনও প্যালেস্তানীয়কে তাদের দেশে আশ্রয় দেবে না।

আজকের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও ইরাক, ইরান, মিশর, আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, জর্ডন, লেবানন, কাতার, লিবিয়া, বাহারিন, তুরস্ক, লিবিয়া প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি দেশের সবকটিই নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত; নিজেদের অর্থনীতি, পররাষ্ট্র ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি ভাবিত। আক্রান্ত প্যালেস্তানীয়দের হয়ে লড়াই করা, আক্রান্তদের আশ্রয় দেওয়া কিংবা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করা প্রভৃতি কোনোটাই তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তাদের কাছে মজহব কিংবা ইসলাম জাতিসত্তার চেয়ে দেশের কল্যাণই মুখ্য। বরং মুসলমানদের বোকা বানাতে, তাদের আবেগকে নিজেদের সমর্থনে রাখার জন্যই মিডিয়ার সামনে কার্যকারিতাহীন ঝাঁঝালো কিছু বক্তব্য রেখে হাত ধুয়ে ফেলেছেন সকলে। দায়িত্ব ওইটুকুই। ইজরাইয়েল- প্যালেস্তাইন সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা তাদের নেই। তাদের লক্ষ্য নয় আক্রান্ত প্যালেস্তানীয়দের আশ্রয় দান ও মুক্তির উপায় খোঁজা। বরং তাদের প্রধান লক্ষ্য নিজের দেশের মানুষের আবেগ, ভোটের পাটিগণিত।

বেশিরভাগ দেশেই এখনো রাজশাসন চালু রয়েছে। দেশগুলি দিনের পর দিন ইজরায়েলের সঙ্গে এবং তার সহযোগী পশ্চিমি দুনিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা বাড়িয়েছে। পর্দার আড়ালে, টেবিলের নীচে ততগুণ নিশ্চিত করেছে ইজরায়েলের মর্যাদা বৃদ্ধি, তার নাগরিক নিরাপত্তা, ব্যবসাবাণিজ্য, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃঢ়তা। একই সারিতে দাঁড়িয়ে এশিয়ার ইসলামি দেশগুলি এবং অবশ্যই সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর পাকিস্তান। বহু ক্ষেত্রে দেশটি প্যালেস্তাইন আক্রমণকে সরাসরি সমর্থন করেছে। কারণ তাদের কাছে আক্রান্তের সাহায্যের চেয়ে আমেরিকা ও চীনের বন্ধুত্বের দাম বেশি। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগ প্রকাশের একটি জনবহুল ভূখণ্ড ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো গুরুত্ব নেই বিশ্ব মানচিত্রে। তাই তাদের আলোচনা আওতার বাইরে রাখাই সমীচীন।

গাজা ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল ধরে চলা ইজরাইয়েল-প্যালেস্তাইনের এই লড়াইকে শুধুমাত্র মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের জায়গা নেই আর। এই যুদ্ধকে দুটি ভিন্ন দিক থেকে বিচার করার অবকাশ রয়েছে। একদিকে সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষ, যারা সাদাকে সাদা, কালোকে কালো দেখে আন্দোলিত হয়। তারা ধর্ম ব্যবসায়ীদের নাটক, মিডিয়ার প্রচার, রাষ্ট্রনেতাদের আবেগমথিত আহ্বানেই প্রভাবিত হয়। আর অন্যদিকে পৃথিবী জুড়ে গড়ে ওঠা শাসন ব্যবস্থায় দেশ নিয়ন্ত্রকদের উদ্দেশ্য। আলাদা আলাদা দেশ, আলাদা আলাদা সংবিধান, আলাদা আলাদা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, আলাদা নেতা, আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি। তাই দু'দলের ভাবনা, বক্তব্য ও আচরণ একই হওয়ার ভাবনাটা নিছকই অলীক আকাঙ্ক্ষা। কোনো যুগে, কোনো কালেই যুদ্ধের শুরু কিংবা সমাপ্তি সাধারণ নাগরিকের মতামতের উপর ভিত্তি করে হয়নি। হয় রাষ্ট্রপ্রধানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। ভারতের মতো সীমিত কিছু দেশে যুদ্ধ হয় আত্মরক্ষার জন্য, দেশের অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিজ্ঞা থেকে। সাধারণ মানুষের ভাবনা, আবেগ, বক্তব্যের ক্ষিপ্রতা, আন্দোলনের অভিমুখ প্রভৃতিও ঠিক করে দেয় শাসনযন্ত্র এবং তাদের পরিচালিত মিডিয়া।

সেই পরিচালনায় বিশ্বের সাধারণ মানুষও দু'ভাগে বিভক্ত। একদল মুসলমানদের পক্ষে, ইসলাম মজহবি প্যালেস্তানীয়দের সমর্থক। তার মৃত্যু, তার ধ্বংস তাদের উদ্বেলিত করে, কষ্ট দেয়, যন্ত্রণায় কাতর করে। অপরদিকে ইজরায়েলের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলায়, শিশু-নারী ও সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে সেই একই মানুষের মন আনন্দিত হয়। রাতে ও দিনে দেশের রাজপথে রাজপথে, হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে অভিনন্দন যাত্রা, আনন্দ উৎসব পালন করে। কারণ যাদের রক্ত ঝরলো তারা কাফের, ইসলাম বিরোধী, কুরান ও আল্লার আদেশ অমান্যকারী। তাই তাদের মৃত্যু, ধ্বংস কাঙ্ক্ষিত! অপরদিকে গোটা পশ্চিমি দুনিয়ার ইসলামবিরোধী জনগণ লক্ষ লক্ষ প্যালেস্তানীয়র মৃত্যুতে, সন্তান হারানো মায়ের হাহাকারে, গণকবরের বীভৎসতাতে চোখ বন্ধ করে অর্থনৈতিক উন্নতির অঙ্ক কষে।

সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার কেন ও কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আজকের ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মুসলমান দেশগুলির পক্ষে কোনো প্রকার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রধান দেশ সৌদি আরব। মিডিয়ার সামনে প্যালেস্তানীয়দের পক্ষে বারবার সোচ্চার হলেও দেশটির অর্থনীতি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশের নিয়ন্ত্রণে। যে দেশগুলি ইজরায়েলের কট্টর সমর্থক ও সহযোগী। মুসলমানদের একতাকে বারবার দুর্বল করেছে। ইজরায়েলের ঘোষিত শত্রু ইরান হওয়ায় বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে সৌদি আরব ও ইজরায়েল বিভিন্ন ইস্যুতে কাছাকাছি এসেছে। দেশটি অদূর ভবিষ্যতে তেলের বাজারের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে বিকল্প অর্থনীতির খোঁজে গিগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক শহর, ইনফ্রাস্ট্রাকচার। বাজেট ট্রিলিয়ন ডলারের। চাই ইজরায়েল প্রযুক্তির। সঙ্গে ইজরায়েলি অর্থে চাঙ্গা থাকা পশ্চিমি দেশগুলির সহায়তা। মানবাধিকার-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে ইজরায়েলের মোসাদ এবং আমেরিকার সিআইএ-র ভয়ে তটস্থ সৌদি আরব প্রশাসন।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহি নিজেরাই আগ্রাসনকারী। ইয়েমেনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমেরিকা থেকে কয়েক কোটি ডলারের অস্ত্র আগেই কিনেছে। অর্থাৎ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থানের প্রশ্নই আসে না। বরং মার্কিন মধ্যস্থতায় ইজরায়েলের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করে ফেলেছে দেশটি। সম্মিলিতভাবে ইজরায়েল বয়কটের পরম্পরা ভেঙে গেছে ২০২০ সালের 'আব্রাহাম চুক্তি'র মাধ্যমে। কৃষি, চিকিৎসা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ইজরায়েল এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এখন যৌথ চুক্তিবদ্ধ দুটি দেশ।

তুরস্ক-ইজরায়েল অন্তরঙ্গতার ইতিহাস আরও পুরনো। তুরস্কই প্রথম মুসলমান দেশ যারা ইজরায়েলকে পূর্ণদেশের মর্যাদা দিয়েছিল। সুতরাং ইজরায়েলের সঙ্গে তুরস্কের বাণিজ্যিক লেন-দেনের বয়স সত্তর বছরেরও বেশি। শুধু তো লেন-দেনের উপর নির্ভর করে বসে থাকে না আমেরিকা বা ইজরায়েলের মতো দেশ। পাশাপাশি কৌশলে তারা তৈরি করে রাখে সামরিক চাপ ও দেশের আভ্যন্তরীণ

সন্ত্রাস কোনো সমাধান নয়, কোনো যুদ্ধই কোনো দেশকে কণামাত্র এগিয়ে দেয় না। তবু বাংলাদেশ পাকিস্তানের মতো কট্টর ইসলামি দেশগুলি সন্ত্রাসের পথেই হাঁটছে।

অস্থিরতা। হামাস প্রশ্নে দেশটিকে চাপে রাখার জন্য সে-দেশের 'কুর্দি' সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখেছে ইজরায়েল। তারা জিইয়ে রেখেছে এই সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের দ্বারা তুরস্কের আভ্যন্তরীণ সমস্যা তৈরির সম্ভাবনাকে। সেদিক থেকে কাতার দেশটি কিছুটা ব্যতিক্রম। এখনো পর্যন্ত দেশটি কট্টর ইজরায়েল বিরোধী। নব্বইয়ের দশকে কিছু ক্ষেত্রে ইরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সমঝোতা তৈরির চেষ্টা হলেও এখনো পর্যন্ত তা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কাতারই এখনো ইররায়েলকে 'দেশের' স্বীকৃতি দেয়নি। এরা হামাসেরও কট্টর সমর্থক। জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন প্যালেস্তাইনের জোরালো দাবি বহুদিন ধরে করে আসছে কাতার। তবে ইসলামি দেশগুলি থেকেই অভিযোগ আসে গোপনে তারাও নাকি আজকাল ইজরায়েলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে। বাহারিন পশ্চিমি দেশগুলির সঙ্গে সুর মিলিয়ে হামাসেরই বরং বিরোধিতা করে। কুয়েত ও ওমানের অবস্থানও ইজরায়েল বিরোধী নয়।

ইজরায়েলের ঘোষিত শত্রু ইরান এবং ইজরায়েলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা অন্যতম প্রধান দেশ। ইরান সামরিক ও পারমাণবিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ায় তাকে যথেষ্ট সমীহ করে উন্নত দেশগুলি। সেই ইরানও দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ের বাইরে গিয়ে বড়ো কোনো হামলা এখনো পর্যন্ত ইজরায়েলের বিরুদ্ধে করেনি। দেশের জনগণের আবেগকে উসকে রাখার জন্য দু-এক ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ তারা নিয়েছে তা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

সিরিয়া ও ইরাকের প্রসঙ্গ এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার কারণ দুটি দেশ আমেরিকার আগ্রাসনের সবচেয়ে বড়ো শিকার। ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ আক্রমণে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ইরাক ও সিরিয়ার সব বড়ো শহর। মৃত্যু হয়েছে কয়েক লক্ষ মানুষের।

প্রতিবেশী মিশর প্রথম দেশ যারা ইজরায়েলের কাছে ভিক্ষার বাটি হাতে সমঝোতায় এসেছিল তাদের হারিয়ে যাওয়া সোনাই উপদ্বীপ ফিরে পাওয়ার জন্য। সেটা ১৯৭৮ সাল। আর প্যালেস্তাইনের প্রতিবেশী জর্ডন দেশটিও গ্যাস ও জলের জন্য সরাসরি ইজরায়েলের উপর নির্ভরশীল।

বাস্তব ঘটনা হলো মধ্যপ্রাচ্য-সহ গোটা বিশ্ব ইজরায়েলের এই প্রত্যাঘাতের বিরোধিতার জায়গায় নেই। হামাসের মতো জঙ্গি সংগঠন সমর্থনের চেয়ে তারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিকাঠামোগত উন্নতিতেই বেশি মনোযোগী। এটা মজহবি কট্টরতা থেকে বেরিয়ে আধুনিক সমাজ ও জীবন বোধের অন্যতম দাবিও বটে। সন্ত্রাস কোনো সমাধান নয়, কোনো যুদ্ধই কোনো দেশকে কণামাত্র এগিয়ে দেয় না। তবু বাংলাদেশ পাকিস্তানের মতো কট্টর ইসলামি দেশগুলি সন্ত্রাসের পথেই হাঁটছে বর্তমানে। আধুনিক জীবনবোধ নয়, তাদের পরিচালক ইসলাম জেহাদি, মজহবি কট্টরতা।

ভারতবর্ষের মাটিতে প্যালেস্তানি পতাকা ওড়ানোটা প্যালেস্তানীয়দের প্রতি মানবিক হওয়ার লক্ষণ নয়, বরং এটা উগ্র ইসলাম আনুগত্য, গণতান্ত্রিক ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতি মোল্লাবাদীদের চ্যালেঞ্জ। অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিধরেরাই এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রক, নিয়ন্ত্রক জীবন-মৃত্যুর। দেশের নেতাদের শুভবুদ্ধির উদয় এবং সন্ত্রাসবাদীদের হিংসা-মৃত্যু-খুনের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার সেই শুভক্ষণের আকাঙ্ক্ষায় গোটা বিশ্ব। বিশ্বের সব সাধারণ নাগরিক পথ চেয়ে আছে সেই সোনালি ভোরের, যেখানে আক্রান্ত ও আক্রমণকারী নেতারা একই টেবিলে বসে চা খাবেন। □

মুরাদ নগরের ঘটনায় ইউনুস সরকারের পদত্যাগ করা উচিত

শিতাংশু গুহ

অসহ্য। আমেরিকায় বসেও বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন দেখে আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থাটা কী, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার নয়। সর্বশেষ মুরাদ নগর, কুমিল্লার ঘটনা (শুক্রবার ২৭ জুন ২০২৫), দরজা ভেঙে এক নেতার নেতৃত্বে মব এক হিন্দু মহিলাকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন চালায়, সম্মানহানি করে, আবার তার ভিডিয়ো তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। ভিডিয়ো দেখাটা অসহনীয়, এরা কি মানুষ?

প্রথমে শুনলাম সে এক বিএনপি নেতা। বিএনপি প্রেস কনফারেন্স করে জানালো, ধর্ষক আওয়ামি লিগ নেতা। উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, কুমিল্লার ঘটনায় আওয়ামি সন্ত্রাসীরা দায়ী। মির্জা ফখরুল বলেন, একজন উপদেষ্টা নিজস্বার্থে মুরাদ নগরের ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চক্রান্ত করছে। রুহিন আহমদ নামে একজন লেখে, ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে ২-৪টা হিন্দু মেয়ে ধর্ষণ হবে, এটা স্বাভাবিক। আজকের পত্রিকা গত ২৯ জুনে হেডিং করেছে— চিৎকার শুনে ছুটে আসা স্থানীয়রা ধর্ষণের শিকার নারীকেই মারধর করে। এই ক'টি বক্তব্য তুলে ধরার কারণ হচ্ছে, এটি আজকের বাংলাদেশের চিত্র। চিৎকার শুনে জনতা ধর্ষিতাকেই মারে, কি ভয়ংকর তাই না?

রাজনৈতিক নেতারা ধর্ষক কোন দলের তা নির্ণয়ে ব্যস্ত। এরাই কিন্তু জোর গলায় বলেন, ধর্ষকের ধর্ম হয় না, অথচ ধর্ষকের দল হয়। ফজর আলি একজন ধর্ষক, এটিই কি যথেষ্ট নয়? ধর্ষিতা হিন্দু হলে ধর্ষকের শাস্তি কমে যায়, তাই না? ব্যাপারটা কি এটা নয় যে, একজন নারী ধর্ষিতা হয়েছে, ধর্ষকের বিচার করবে দেশ। মহিলার বিবস্ত্র দৃশ্য ইউনুস সরকারের উলঙ্গ চিত্রটি প্রকাশ করে দিয়েছে। ধর্ষক ফজর আলি বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। সেই ধর্ষিতা বাংলাদেশের নিরাপত্তাহীন রমনীদের আতঙ্কের চিত্রপট, হিন্দুদের দুর্দশার বাস্তব চিত্র। দুই সন্তানের সেই জননীর ভবিষ্যৎ কী? বাংলাদেশের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ কী? দেশ, সরকার, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা, প্রশাসন, পুলিশ-মিলিটারি-র‍্যাফ সবাই হিন্দুদের বিপক্ষে, তখন হিন্দুদের বাঁচার উপায় কী?

ধর্ষক কেন সাহস পেয়েছে এমন একটি ঘটনা ঘটাতে? কারণ সে জানে, হিন্দু রমণী ধর্ষণ করলে কিচ্ছু হবে না। মহিলা নিজেই মামলা করেছেন। প্রচার হলো, তিনি মামলা প্রত্যাহার করেছেন। এটি সত্য নয়, মহিলা আরও একটি মামলা করেছেন। সচরাচর এমন ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া হয়। মহিলাকে ধন্যবাদ জানাই যে, তিনি মামলা করার সাহস দেখিয়েছেন। তার স্বামী দুবাই প্রবাসী।

এ ঘটনাকে হালকা করার জন্য অনেক রকম গল্প ছড়ানো হয়েছে। কাজ হয়নি। এ ঘটনা আর ধামাচাপা দেওয়ার সুযোগ নেই, বিশ্ব এটি জেনে গেছে। জেনে গেছে, ড. ইউনুস বাংলাদেশকে কোনখানে নিয়ে গেছেন। ইউরোপে এমন ঘটনায় সরকারের পতন ঘটে। এই ঘটনায় পুরো অন্তর্বর্তী সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। আসিফ নজরুল এবং আসিফ মাহমুদ এখনও কীভাবে ক্ষমতায় আছেন? সেনাপ্রধান বলেছিলেন, আমি দায়িত্ব নিলাম। তার দায়িত্বে দেশ এখন মব ও ধর্ষকদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে। একজন মহিলা উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনার বউ, মেয়ে বা বোনের সঙ্গে এমনটা হলে কী করতেন? আপনারা বিচার করতে না পারলে আমাদের উপর ছেড়ে দিন।

গত ২৯ জুন একটি দল মুরাদ নগর গিয়ে তদন্ত করে। ওসি জাহিদুর রহমান জানান, ফজর আলি-সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধর্ষিতা দুটি মামলা করেছেন। তিনি বাবার বাড়িতে ধর্ষিতা হন, তার বাবা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। একজন বাবা কতটা অসহায় হলে নিজের মেয়ের ধর্ষণের কথা স্বীকার করেন? 'উপায় নেই গোলাম হোসেন', এটি বাংলাদেশ! ধর্ষণ বিশেষত হিন্দু রমণীর আর জোর করে ধর্মান্তর এখানে জায়েজ। কারণ ওদের কাছে হিন্দু রমণী শুধুমাত্র গনিমতের মাল।

একজন মুমিনা ঘটনাটিকে পরকীয়া বলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করছে। মুমিনা তার মুমিন ভাইদের দোষ ঢাকতে চাচ্ছেন। এক মুমিন আর এক মুমিনের দোষ ঢাকবে এটাই স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে মানবিকতা বলে কিছু হয় না। এখন দেশ মুমিনদের, উপদেষ্টারা মুমিন, ড. ইউনুস মুমিন, রাজনীতিকরা মুমিন, ধর্ষক মুমিন সবাই মিলে ধর্ষকের দোষ ঢাকবে এটাই স্বাভাবিক। কদিন আগে এনসিপির নেতাদের দলীয় নেত্রীদের সঙ্গে ঘুমানোর ইচ্ছার কথা সকলে বেশ উপভোগ করেছে। নোংরামিটা এদের কাছে সাধারণ ব্যাপার। ওসি জানিয়েছে, এটি পরকীয়া নয়। প্রমাণ সাপেক্ষে বাকিরাও বলতে বাধ্য হচ্ছে, এটি পরকীয়া নয়। সরকার মুখরক্ষার খাতিরে এ ঘটনার বিচার করতে বাধ্য হবে, যদিও বিচার কতদিনে হবে আর কী হবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

বিশেষ ঘোষণা

স্বস্তিকার পাঠক-পাঠিকা, প্রচার প্রতিনিধি, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, গত ৭৭ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বস্তিকা সাপ্তাহিক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু স্বস্তিকা পাঠে আগ্রহী বহু মানুষের কাছে ভাষাগত কারণে এটা সহজপাঠ্য হচ্ছিল না। ফলে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কিছু স্বস্তিকাপ্রেমী স্বস্তিকাপাঠ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। সেইসব হিন্দিভাষী পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ ও অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস্ ফাউণ্ডেসন-এর পক্ষ থেকে স্বস্তিকা-র হিন্দি সংস্করণও প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শুভ জন্মাষ্টমী তিথির প্রাক্-লগ্নে আগামী ১৫ আগস্ট হিন্দি স্বস্তিকা (মাসিক) আত্মপ্রকাশ করবে। আপাতত মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রতিমাসের ১৫ তারিখে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। মূল্য ধার্য হয়েছে ৩০ টাকা।

আপনাদের সহযোগিতা, ভালোবাসা ও পরামর্শ এই নতুন সংস্করণটির চলার পথকে সমৃদ্ধ করবে— এটাই আন্তরিকভাবে কামনা করি।

প্রকাশক,
শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্টেসন

আইন কি শক্তিশালী সিস্টেমের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না?

বিপ্লব বিকাশ

গত ৬ জুলাই বিকেলে চিড়িয়ামোড়ে গ্রিন সিগন্যালের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। পাশে একজন মোটরবাইকচালক নিজের হেলমেট খুলে বললেন, দাদা, রামনবমীর দিন তলোয়ার নিয়ে বেরোলে এই কলকাতা পুলিশ আমাদের কেস দেয়। ছেলেদের তুলে নিয়ে গিয়ে আর্মস অ্যাক্টে ভরে দেয়। তাহলে এদেরকে তুলছে না কেন? এই দেখুন, রাস্তায় ছোটো ছোটো বাচ্চারা খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘুরছে, খেলা দেখাচ্ছে। এদের জন্য কোনো আর্মস অ্যাক্ট নেই নাকি? সিগন্যাল ততক্ষণে সবুজ হয়ে গেছে, আমি আমার গন্তব্যের দিকে এগোলাম। কিন্তু সেই ভদ্রলোকের প্রশ্নগুলি মনে ঝড় তুলল।

সামাজিক মাধ্যম থেকে জানতে পারলাম শিয়ালদহ স্টেশনে লোকাল ট্রেনে বহু কিশোর খোলা তলোয়ার নিয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টে সিটের নীচে তলোয়ার রাখছিল। যাত্রীরা পুলিশকে ডেকেও সারা পায়নি। পরে কয়েকজন এল ঠিকই, কিন্তু পরিণাম কিছুই হলো না। যাত্রীদের সঙ্গে সিটের নীচে তলোয়ারও তাদের গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হলো শিয়ালদহ স্টেশন থেকে। তারই মাঝে আরও একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। একজন যুবকের রক্তাক্ত ছবি। ভিড়ের মধ্যে মহরমের তলোয়ারের আঘাতে আহত হয়েছেন তিনি।

ভাবুন তো, এই বাচ্চাগুলো কোন সাহসে শিয়ালদহের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বেষ্টিত স্টেশনে খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারল? ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে তলোয়ার নিয়ে ঘুরলো? যাত্রীরা বার বার পুলিশকে ডেকেও কোনো সাড়া-শব্দ পেল না। রাস্তায়, ট্রেনে, বাজারে সব জায়গায় নিজেদের পরিকল্পনা মতো মহরমের আগে থেকেই যুবকরা তলোয়ার নিয়ে ঘুরতে শুরু করলেও পুলিশ-প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে তাদের প্রটেকশন দেয়। কেন? 'সিস্টেম, বাবুমশাই সিস্টেম।' পুলিশ মনে হয় বুঝে গেছে যে, রামনবমীতে গ্রেপ্তার করতেই হবে আর মহরমের সময় ওদের দিকে তাকানোই যাবে না। উলটে প্রটেকশন দিতে হবে।

আইন তো সবার জন্য সমান হয়, তাই না? না, একদমই নয়। সেটা সংবিধানে শুধুমাত্র লেখা আছে, কিন্তু সেটাকে যথাযথভাবে পালন করানোর দায়িত্ব প্রশাসনের। খুব স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, পুলিশ-প্রশাসন ও সরকার— এই সংস্থাগুলির থেকেও প্রভাবী একটি দলীয় সিস্টেম, যা পরোক্ষভাবে এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে বা প্রভাবিত করে। আজকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমনি এমনি মুসলমানদের 'দুধেল গাই' বলে আখ্যা দিচ্ছেন না। তিনি জানেন তারা তাঁর 'ভোটব্যাংক'। ওদেরকে অসন্তুষ্ট করা চলবে না। পুলিশ জানে, পুলিশ মন্ত্রীকে অসন্তুষ্ট করলে নিজের চাকরিটা ঠিক মতো করতে পারবে না। পানিশমেন্ট ট্রান্সফার তো হবেই, তার সঙ্গে জীবনের শান্তিও চলে যাবে। আমলাতন্ত্র জানে তাদের বস কী চায়।

যদি আমরা আইনের শাসন চাই এবং সবার জন্য সমান আইন ব্যবস্থা চাই, তাহলে সেই সিস্টেমকে পালটাতে হবে। শুধু সরকার বদল যথেষ্ট নয়। সরকার একটি মাধ্যম, কিন্তু সিস্টেম জগদ্দল পাথর, তাকে পরিকল্পনা করে পালটাতে হয়। আজকে ছোটো ছোটো বাচ্চারা সেই সিস্টেমের কারণেই খোলা তলোয়ার দেখিয়ে আপনার মনে ভয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে। আমরা পুলিশ-প্রশাসনকে দোষ দিয়ে ভাবছি নিজের কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে গেছে। মনে করছি মনটা একটু হালকা হলো।

এটুকু করলে হবে না। সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সংগঠিতভাবে সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক পথে এই সিস্টেম পালটাতে হবে। আর রাষ্ট্রহিতের সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে হবে। রাজ্য সরকারের সিস্টেমে কোনো ন্যায় যে নেই, সেটা রাজ্যবাসী পদে পদে উপলব্ধি করতে পারছি। রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা হলেও আমরা সবাই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। সংবিধানিক অধিকার সবার জন্য সমানভাবে পালিত হোক আমরা সেটা চাই। তাহলে এই আইনি অসংগতিকে এবং পুলিশ, প্রশাসন, রাজ্য সরকারের দ্বিচারিতাকে আটকানোর জন্য একজোট হয়ে সুস্থ পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে সকলকে ভাবতে হবে। এইসময় এটা প্রত্যেক বঙ্গবাসীর কর্তব্য। বাচ্চাদের হাতে খোলা তলোয়ার দিয়ে সমাজে আতঙ্কের পরিবেশ গড়ে তুলতে দেওয়া যাবে না। এই সিস্টেম পরিবর্তন ছাড়া বিকল্প কিছু নেই। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(২৮)
কর্তব্যের জাগরণ

দীর্ঘ বারো বছর পর আবার নাগপুরে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশন হতে চলেছে। এই ঘোষণায় নাগপুরবাসী অত্যন্ত খুশি, চারিদিকে এক নবীন উদ্দীপনার জোয়ার। ১৯২০ সাল তাদের কাছে হয়ে উঠল আশা, উৎসাহ, উৎসবের বছর। ডাঃ পরাঞ্জপে 'ভারত স্বয়ংসেবক মণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করে শুরু করেছিলেন এই বিশাল কর্মযজ্ঞের কর্তব্য যাত্রা। তাঁর সহকারী ছিলেন ডাক্তারজী। অধিবেশনের প্রস্তুতি কাজে প্রদেশ জুড়ে চলছিল সভা সমিতি, সংগঠন কার্য। স্বয়ংসেবক মণ্ডলের মাধ্যমে চলছিল স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কাজ। ডাক্তারজী সমস্ত বিষয়ে নজর রাখতেন, যাতে ব্যবস্থা সুন্দর ও নিখুঁত হয়।

এমন উৎসবমুখর পরিবেশে হঠাৎ বজ্রপাত ঘটল। ভারতের মুকুটহীন সম্রাট লোকমান্য তিলক সামান্য অসুস্থতার মধ্যে ৩১ জুলাই পরলোকগমন করেন। সমগ্র দেশ শোকসাগরে নিমজ্জিত হলো, নাগপুরবাসীর দুঃখ সীমাহীন। লোকমান্য তিলকের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে ডাক্তারজী সেদিন ডাঃ মুঞ্জের কাছে যাচ্ছিলেন। পথে কিছু ছাত্র হইচই করতে করতে বল খেলছে। তাদের ওই আনন্দ দেখে ডাক্তারজী নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, আরে! লোকমান্য তিলকের মৃত্যু হয়েছে আর তোমরা খেলা করছ? তাঁর এই কথা শুনে দু'এক জন তর্ক করতে গিয়েও ডাক্তারজীর সেই উগ্র রূপ দেখে চুপচাপ সেখানে থেকে সরে পড়ল। সেদিনের ঘটনা একজন তরুণের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। ডাক্তারজীর প্রশ্ন তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। সেদিনের ডাক্তারজীর কথা তার জীবনের সম্পূর্ণ গতিপথকেই পরিবর্তন করে দিল। পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে সঙ্ঘের কাজে পূর্ণ সমর্পণ করেন। তিনি ছিলেন দাদারাও পরমার্থ।

(২৯)
শ্রীঅরবিন্দ সকাশে

লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর পর নাগপুর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। বিশেষত সামনেই কংগ্রেসের অধিবেশন, এমতাবস্থায় দেশের জন্য বর্তমানের উপযোগী ভাবনা সকলের সামনে তুলে ধরার মতো নেতৃত্বের অভাব ভীষণ রকম অনুভূত হচ্ছিল। অপরদিকে কলকাতায় এক বিশেষ অধিবেশনে খিলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর আধিপত্য নাগপুরের কার্যকর্তাদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছিল। সকলেই চাইছিলেন তিলকের ভাবধারার অনুরূপ মানসিকতার কেউ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করুক।

আলোচনায় স্থির হয় যে, এমন পদে একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন শ্রীঅরবিন্দ। কিন্তু তিনি তো তখন পণ্ডিচেরিতে সাধনারত রয়েছেন। তিনি কি রাজি হবেন এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে? তবুও সংকটময় পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করা আবশ্যক, যদি তাঁকে অনুরোধ করে আনা যায় সমর্থ হয় তবে অত্যন্ত মঙ্গলজনক। তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য ডাঃ মুঞ্জে এবং নাগপুরের তরুণদের পক্ষ থেকে যাবেন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার।

সময়টা ছিল ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর। দুজনেই যথাসময়ে শ্রীঅরবিন্দ সকাশে উপস্থিত হলেন। আলোচনাও হলো। চার-পাঁচদিন তাঁরা দুজনেই পণ্ডিচেরিতে ছিলেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির বিষয়ে ঠিক কী কী আলোচনা হয়েছিল তা জানা যায় না অন্য কোন সাক্ষী না থাকার কারণে। তবে শ্রীঅরবিন্দকে নেতৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি পণ্ডিচেরিতে তাঁর সাধনা ছেড়ে আসতে অসম্মত হন। ১৯১০ সাল থেকে সাধনারত শ্রীঅরবিন্দকে জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য অনেকেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন, স্বয়ং লোকমান্য তিলকের আগ্রহে এক ব্যক্তি একটি পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানালে শ্রীঅরবিন্দ জানান, 'আমার সামনে এত বিরাট কাজ পড়ে আছে যে এখনই সরকারের অতিথি হয়ে সময় নষ্ট করার এতটুকু ইচ্ছা আমার নেই। ভারতের জন্য যা করার তা আমি নিজের মতো করে করছি। আমার মনোগত ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার আগে আমি কোনো দায়িত্বই নিজের মাথায় নিতে পারছি না।'

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শ্রীঅরবিন্দ ডাঃ মুঞ্জে ও ডাক্তারজীকেও এমনই কিছু উত্তর দিয়ে থাকবেন। কিছুটা বিষণ্ণ মনে তাঁরা নাগপুরে ফিরে আসেন।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস